আল মা–য়েদাহ

৫

নামকরণ

এ সূরার ১৫ রুকূ'র

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ

আয়াতে উল্লেখিত "মা–য়েদাহ" শব্দ থেকে এ নামকরণ করা হয়েছে। কুরআনের অধিকাংশ সূরার নামের মতো এ সূরার নামের সাথেও এর আলোচ্য বিষয়বস্তুর তেমন কোন সম্পর্ক নেই। নিছক অন্যান্য সূরা থেকে আলাদা হিসেবে চিহ্নিত করার জন্যই একে এ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হোদাইবিয়ার সন্ধির পর ৬ হিজরীর শেষের দিকে অথবা ৭ হিজরীর প্রথম দিকে এ সূরাটি নাযিল হয়। সূরায় আলোচ্য বিষয় থেকে একথা সুস্পষ্ট হয় এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনাও এর সত্যতা প্রমাণ করে। ষষ্ঠ হিজরীর যিলকাদ মাসের ঘটনা। চৌদ্দশ' মুসলমানকে সাথে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উমরাহ সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় উপস্থিত হয়েছেন। কিন্তু কুরাইশ কাফেররা শত্রুতার বশবর্তী হয়ে আরবের প্রাচীনতম ধর্মীয় ঐতিহ্যের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করে তাঁকে উমরাহ করতে দিল না। অনেক তর্ক বিতর্ক ও বাদানুবাদের পর তারা এতটুকু মেনে নিল যে, আগামী বছর আপনারা আল্লাহর ঘর যিয়ারত করার জন্য আসতে পারেন। এ সময় একদিকে মুসলমানদেরকে কাবাঘর যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করার নিয়ম কানুন বাতলে দেবার প্রয়োজন ছিল, যাতে পরবর্তী বছর পূর্ণ ইসলামী শান শওকতের সাথে উমরাহর সফর করা যায় এবং অন্য দিকে তাদেরকে এ মর্মে ভালভাবে তাকীদ করারও প্রয়োজন ছিল যে, কাফের শত্রু দল তাদের উমরাহ করতে না দিয়ে যে বাড়াবাড়ি করেছে তার জবাবে তারা নিজেরা অগ্রবর্তী হয়ে যেন আবার কাফেরদের ওপর কোন অন্যায় বাড়াবাড়ি ও জুলুম না করে বসে। কারণ অনেক কাফের গোত্রকে হজ্জ সফরের জন্য মুসলিম অধিকারভুক্ত এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া আসা করতে হতো। মুসলমানদেরকে যেভাবে কাবা যিয়ারত করতে দেয়া হয়নি সেভাবে তারাও এ ক্ষেত্রে জোর পূর্বক এসব কাফের গোত্রের কাবা যিয়ারতের পথ বন্ধ করে দিতে পারতো। এ সূরার শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ যে ভাষণটির অবতারণা করা হয়েছে সেখানে এ প্রসংগই আলোচিত হয়েছে। সামনের দিকে তের রুকূ'তে আবার এ প্রসংগটি উত্থাপিত হয়েছে। এ থেকে প্রমাণ হয় যে, প্রথম রুকূ' থেকে নিয়ে চৌদ্দ রুকূ' পর্যন্ত একই ভাষণের ধারাবাহিকতা চলছে। এ ছাড়াও এ সূরার মধ্যে আর যে সমস্ত বিষয়বস্তু আমরা পাই তা সবই একই সময়কার বলে মনে হয়।

বর্ণনার ধারাবাহিকতা দেখে মনে হয় এ সমগ্র সূরাটি একটি মাত্র ভাষণের অন্তরভুক্ত এবং সম্ভবত এটি একই সংগে নাযিল হয়েছে. আবার এর কোন কোন আয়াত পরবর্তীকালে পৃথক পৃথকভাবে নাযিল হতেও পারে এবং বিষয়বস্তুর একাত্মতার কারণে সেগুলোকে এ সূরার বিভিন্ন স্থানে জায়গা মতো জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্ণনার ধারাবাহিকতার মধ্যে কোথাও সামান্যতম শূন্যতাও অনুভূত হয় না। ফলে একে দুটি বা তিনটি ভাষণের সমষ্টি মনে করার কোন অবকাশ নেই।

নাযিলের উপলক্ষ

আলে ইমরান ও আননিসা সূরা দু'টি যে যুগে নাযিল হয় সে যুগ থেকে এ সূরাটির নাযিলের যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে বিরাজমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে অনেক বড় রকমের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল। ওহোদ যুদ্ধের বিপর্যয় যেখানে মদীনার নিকটতম পরিবেশও মুসলমানদের জন্য বিপদসংকুল করে তুলেছিল; সেখানে এখন সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। আরবে ইসলাম এখন একটি অজেয় ও অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র একদিকে নজ্দ থেকে সিরিয়া সীমান্ত এবং অন্যদিকে লোহিত সাগর থেকে মক্কার নিকট এলাকা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। ওহোদে মুসলমানরা যে আঘাত পেয়েছিল তা তাদের হিম্মত ও সাহসকে দমিত এবং মনোবলকে নিস্তেজ করার পরিবর্তে তাদের সংকল্প ও কর্মোন্মাদনার জন্য চাবুকের কাজ করেছিল। তারা আহত সিংহের মতো গর্জে ওঠে এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে সমগ্র পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। তাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও আত্মদানের ফলে মদীনার চারদিকে দেড়শ' দুশ' মাইলের মধ্যে সমস্ত বিরোধী গোত্রের শক্তির দর্প চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। মদীনার ওপর সবসময় যে ইহুদী বিপদ শকুনির মতো ডানা বিস্তার করে রেখেছিল তার অশুভ পাঁয়তারার অবসান ঘটেছিল চিরকালের জন্য। আর হিজাযের অন্যান্য যেসব জায়গায় ইহুদী জনবসতি ছিল সেসব এলাকা মদীনার ইসলামী শাসনের অধীনে এসে গিয়েছিল। ইসলামের শক্তিকে দমন করার জন্য কুরাইশরা সর্বশেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিল খন্দকের যুদ্ধে। এতেও তারা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। এরপর আরববাসীদের মনে এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহই রইলো না যে, ইসলামের এ আন্দোলনকে খতম করার সাধ্য দুনিয়ার আর কোন শক্তির নেই। ইসলাম এখন আর নিছক একটি আকীদা-বিশ্বাস ও আদর্শের পর্যায় সীমিত নয়। নিছক মন ও মস্তিষ্কের ওপরই তার রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত নয়। বরং ইসলাম এখন একটি পরাক্রান্ত রাষ্ট্রীয় শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং এ রাষ্ট্রের সীমানায় বসবাসকারী সমস্ত অধিবাসীর জীবনের ওপর তার কর্তৃত্ব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখন মুসলমানরা এতটা শক্তির অধিকারী যে, যে চিন্তা ও ভাবধারার ওপর তারা ঈমান এনেছিল সে অনুযায়ী স্বাধীনভাবে নিজেদের জীবনকে গড়ে তোলার এবং সে চিন্তা ও ভাবধারা ছাড়া অন্য কোন আকীদা-বিশ্বাস, ভাবধারা, কর্মনীতি অথবা আইন-বিধানকে নিজেদের জীবন ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করতে না দেয়ার পূর্ণ ইখতিয়ার তারা লাভ করেছিল।

তাছাড়া এ কয়েক বছরের মধ্যে ইসলামী মূলনীতি ও দৃষ্টিভংগী অনুযায়ী মুসলমানদের নিজস্ব একটি কৃষ্টি ও সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছিল. এ সংস্কৃতি জীবনের যাবতীয় বিস্তারিত বিষয়ে অন্যদের থেকে আলাদা একটি স্বতন্ত্র ভাবমূর্তির অধিকারী ছিল। নৈতিকতা,

স্বভাব-চরিত্র, আচার-আচরণ, জীবন যাপন প্রণালী, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষেত্রে মুসলমানরা এখন অমুসলিমদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ইসলামী রাষ্ট্রের সমস্ত মুসলিম অধ্যুসিত জনপদে মসজিদ ও জামায়াতের সাথে নামায পড়ার ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক জনবসতিতে ও প্রত্যেক গোত্রে একজন ইমাম নিযুক্ত রয়েছে। ইসলামের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন-কানুন অনেকটা বিস্তারিত আকারে প্রণীত হয়ে গেছে এবং মুসলমানদের নিজস্ব আদালতের মাধ্যমে সর্বত্র সেগুলো প্রবর্তিত হচ্ছে। লেনদেন ও কেনা-বেচা ব্যবসায় বাণিজ্যের পুরাতন রীতি ও নিয়ম রহিত করে নতুন সংশোধিত পদ্ধতির প্রচলন চলছে। সম্পত্তির উত্তরাধিকারের স্বতন্ত্র বিধান তৈরী হয়ে গেছে। বিয়ে ও তালাকের আইন, শ'রয়ী পরদা ও অনুমতি নিয়ে অন্যের গৃহে প্রবেশের বিধান এবং যিনা ও মিথ্যা অপবাদের শাস্তি বিধান জারি হয়ে গেছে। এর ফলে মুসলমানদের সমাজ জীবন একটি বিশেষ ছাঁচে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। মুসলমানদের ওঠা বসা, কথাবার্তা, পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবন যাপন ও বসবাস করার পদ্ধতিও একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্টে সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। এভাবে ইসলামী জীবন একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করার এবং মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও তামাদ্দুন গড়ে ওঠার পর, তারা যে আবার কোন দিন অমুসলিম সমাজের সাথে মিলে একাত্ম হয়ে যেতে পারে। তেমনটি আশা করা তৎকালীন অমুসলিম বিশ্বের পক্ষে আর সম্ভবপর ছিল না।

হোদাইবিয়ার চুক্তি সম্পাদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত মুসলমানদের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধক ছিল এই যে, কুরাইশ কাফেরদের সাথে তাদের ক্রমাগত যুদ্ধ, সংঘর্ষ ও সংঘাত লেগেই ছিল। নিজেদের ইসলামী দাওয়াতের সীমানা বৃদ্ধি ও এর পরিসর প্রশস্ত করার কোন অবকাশই তারা পায়নি। হোদাইবিয়ার বাহ্যিক পরাজয় ও প্রকৃত বিজয় এ বাধা দূর করে দিয়েছিল। এর ফলে কেবল নিজেদের রাষ্ট্রীয় সীমায়ই তারা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে পায়নি বরং আশপাশের বিভিন্ন এলাকায় ইসলামের দাওয়াত বিস্তৃত করার সুযোগ এবং অবকাশও লাভ করেছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কাজটিরই উদ্বোধন করলেন ইরান, রোম, মিসর ও আরবের বাদশাহ ও রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পত্র লেখার মাধ্যমে। এ সাথে ইসলাম প্রচারকবৃন্দ মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানাবার জন্য বিভিন্ন গোত্র ও কওমের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লেন।

আলোচ্য বিষয়সমূহ

এ ছিল সূরা মা-য়েদাহ নাযিল হওয়ার প্রেক্ষাপট। নিম্নলিখিত তিনটি বড় বড় বিষয় এ সূরাটির অন্তরভুক্ত ঃ

এক ঃ মুসলমানদের ধর্মীয়, তামাদ্দুনিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আরো কিছু বিধি নির্দেশ। এ প্রসংগে হজ্জ সফরের রীতি-পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। ইসলামী নিদর্শনগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কাবা যিয়ারতকারীদেরকে কোন প্রকার বাধা না দেবার হুকুম দেয়া হয়। পানাহার দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে হালাল ও হারামের চূড়ান্ত সীমা প্রবর্তিত হয়। জাহেলী যুগের মনগড়া বাধা নিষেধগুলো উঠিয়ে দেয়া হয়। আহলি কিতাবদের সাথে পানাহার ও তাদের মেয়েদের বিয়ে করার অনুমতি দেয়া হয়। অযু,

গোসল ও তায়াম্মুম করার রীতি পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। বিদ্রোহ ও অরাজকতা সৃষ্টি এবং চুরি–ডাকাতির শাস্তি প্রবর্তিত হয়। মদ ও জুয়াকে চূড়ান্তভাবে হারাম ও নিষিদ্ধ করা হয়। কসম ভাঙার কাফ্‌ফারা নির্ধারিত হয়। সাক্ষ প্রদান আইনের আরো কয়েকটি ধারা প্রবর্তন করা হয়।

দুই ঃ মুসলমানদেরকে উপদেশ প্রদান। এখন মুসলমানরা একটি শাসক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে যাওয়ায় তাদের হাতে ছিল শাসন শক্তি। এর নেশায় বহু জাতি পথভ্রষ্ট হয়। মজলুমীর যুগের অবসান ঘটতে যাচ্ছিল এবং তার চাইতে অনেক বেশী কঠিন পরীক্ষার যুগে মুসলমানরা পদার্পণ করেছিল। তাই তাদেরকে সম্বোধন করে বারবার উপদেশ দেয়া হয়েছে ঃ ন্যায়, ইনসাফ ও ভারসাম্যের নীতি অবলম্বন করো। তোমাদের পূর্ববর্তী আহ্‌লি কিতাবদের মনোভাব ও নীতি পরিহার করো। আল্লাহর আনুগত্য এবং তাঁর হুকুম ও আইন কানুন মেনে চলার যে অংগীকার তোমরা করেছো তার ওপর অবিচল থাকো। ইহুদী ও খৃস্টানদের মতো তার সীমালংঘন করে তাদের মতো একই পরিণতির শিকার হয়ো না। নিজেদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালার জন্য আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করো। মুনাফিকী নীতি পরিহার করো।

তিন ঃ ইহুদী ও খৃস্টানদেরকে উপদেশ প্রদান। এ সময় ইহুদীদের শক্তি খর্ব হয়ে গেছে। উত্তর আরবের প্রায় সমস্ত ইহুদী জনপদ মুসলমানদের পদানত। এ অবস্থায় তাদের অনুসৃত ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তাদেরকে আর একবার সতর্ক করে দেয়া হয়। তাদেরকে সত্য–সঠিক পথে আসার দাওয়াত দেয়া হয়। এ ছাড়া যেহেতু হোদাইবিয়ার চুক্তির কারণে সমগ্র আরবে ও আশপাশের দেশগুলোয় ইসলামের দাওয়াত প্রচারের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল তাই খৃস্টানদেরকেও ব্যাপকভাবে সম্বোধন করে তাদের বিশ্বাসের ভ্রান্তিগুলো জানিয়ে দেয়া হয় এবং শেষ নবীর প্রতি ঈমান আনার জন্য তাদেরকে আহবান জানানো হয়। যেসব প্রতিবেশী দেশে মূর্তিপূজারী ও অগ্নি উপাসক জাতির বসবাস ছিল সেসব দেশের অধিবাসীদেরকে সরাসরি সম্বোধন করা হয়নি। কারণ ইতিপূর্বে তাদের সমমনা আরবের মুশরিকদেরকে সম্বোধন করে মক্কায় যে হেদায়াত নাযিল হয়েছিল তা–ই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۚ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ①

হে ঈমানদারগণ! বন্ধনগুলো পুরোপুরি মেনে চলো।[১] তোমাদের জন্য চতুষ্পদ গৃহপালিত পশু জাতীয় সব পশুই হালাল করা হয়েছে[২] তবে সামনে যেগুলো সম্পর্কে তোমাদের জানানো হবে সেগুলো ছাড়া। কিন্তু ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করা নিজেদের জন্য হালাল করে নিয়ো না।[৩] নিসন্দেহে আল্লাহ যা ইচ্ছা আদেশ করেন।[৪]

১. অর্থাৎ এ সূরায় তোমাদের প্রতি যে সমস্ত নীতি–নিয়ম ও বিধি–বিধান আরোপ করা হচ্ছে এবং সাধারণভাবে আল্লাহর শরীয়াত যেগুলো তোমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে, সেগুলো মেনে চলো। ভূমিকা স্বরূপ এ ছোট্ট একটি বাক্যের অবতারণা করার পর এবার সে বাঁধনগুলোর বর্ণনা শুরু হচ্ছে যেগুলো মেনে নেবার হুকুম দেয়া হয়েছে।

২. মূল শব্দ হচ্ছে, "বাহীমাতুল আন'আম"। "আন'আম" শব্দটি বললে আরবী ভাষায় উট, গরু, ছাগল ও ভেড়া বুঝায়। আর "বাহীমা" বলতে প্রত্যেক বিচরণশীল চতুষ্পদ জন্তু বুঝানো হয়। যদি আল্লাহ বলতেন, "আন'আম" তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে, তাহলে এর ফলে কেবলমাত্র আরবীতে যে চারটি জন্তুকে আন'আম বলা হয় সে চারটি জন্তুই হালাল হতো। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন ঃ গৃহপালিত পশু পর্যায়ের বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। এর ফলে নির্দেশটি ব্যাপকতা লাভ করেছে এবং গৃহপালিত গবাদি পশু পর্যায়ের সমস্ত বিচরণশীল চতুষ্পদ প্রাণী এর আওতায় এসে গেছে। অর্থাৎ যাদের শিকারী দাঁত নেই, যারা জান্তব খাদ্যের পরিবর্তে উদ্ভিজ্জ খাদ্য খায় এবং অন্যান্য প্রাণীগত বৈশিষ্টের ক্ষেত্রে আরবের 'আন'আম'–এর সাথে সাদৃশ্য রাখে। এ সংগে এখানে এ ইংগিতও পাওয়া যায় যে, গৃহপালিত চতুষ্পদ পশুর বিপরীতধর্মী যে সমস্ত পশুর শিকারী দাঁত আছে এবং অন্য প্রাণী শিকার করে খায়, সেসব পশু হালাল নয়। এ ইংগিতটিকে সুস্পষ্ট করে হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরিষ্কারভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, শিকারী হিংস্র প্রাণী হারাম। অনুরূপভাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সব পাখিকেও হারাম গণ্য করেছেন যাদের শিকারী পাঞ্জা আছে, অন্য প্রাণী

শিকার করে খায় বা মৃত খায়। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ

نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِىْ نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِىْ مَخْلَبٍ مِّنَ الطَّيْرِ –

"নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিকারী দাঁত সম্পন্ন প্রত্যেকটি পশু এবং নখরধারী ও শিকারী পাঞ্জা সম্পন্ন প্রত্যেকটি পাখি আহার করতে নিষেধ করেছেন।" এর সমর্থনে অন্যান্য বহু সংখ্যক সাহাবীর হাদীসও বর্ণিত হয়েছে।

৩. কাবাঘর যিয়ারত করার জন্য যে ফকিরী পোশাক পরা হয় তাকে বলা হয় "ইহরাম।" কাবার চারদিকে কয়েক মনযিল দূরত্বে একটি করে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। কোন যিয়ারতকারীর নিজের সাধারণ পোশাক বদলে ইহরামের পোশাক পরিধান না করে এ সীমানাগুলো পার হয়ে এগিয়ে আসার অনমুতি নেই। এ পোশাকের মধ্যে থাকে কেবল মাত্র একটি সেলাই বিহীন লুংগী ও একটি চাদর। চাদরটি দিয়ে শরীরের ওপরের অংশ ঢাকা হয়। একে ইহরাম বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এ পোশাক পরিধান করার সাথে সাথে মানুষের জন্য এমন অনেক কাজ হারাম হয়ে যায় যেগুলো স্বাভাবিক অবস্থায় তার জন্য হালাল ছিল। যেমন ক্ষৌরকার্য করা, সুগন্ধি ব্যবহার, সবধরনের সাজসজ্জা, সৌন্দর্য চর্চা, যৌনাচার ইত্যাদি। এ অবস্থায় কোন প্রাণী হত্যা করা যাবে না, শিকার করা যাবে না এবং শিকারের খোঁজও দেয়া যাবে না।, এগুলোও এ বিধিনিষেধের অন্তরভুক্ত।

৪. অর্থাৎ আল্লাহ সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী একচ্ছত্র শাসক। তিনি নিজের ইচ্ছেমতো যে কোন হুকুম দেবার পূর্ণ ইখতিয়ার রাখেন। তাঁর নির্দেশ ও বিধানের ব্যাপারে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করার বা আপত্তি জানানোর কোন অধিকার মানুষের নেই। তাঁর সমস্ত বিধান জ্ঞান, প্রজ্ঞা, যুক্তি, ন্যায়নীতি ও কল্যাণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলেও ঈমানদার মুসলিম যুক্তিসংগত, ন্যায়ানুগ ও কল্যাণকর বলেই তার আনুগত্য করে না বরং একমাত্র সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর হুকুম বলেই তার আনুগত্য করে। যে জিনিসটি তিনি হারাম করে দিয়েছেন তা কেবল তাঁর হারাম করে দেবার কারণেই হারাম হিসেবে গণ্য। আর ঠিক তেমনিভাবে যে জিনিসটি তিনি হালাল করে দিয়েছেন সেটির হালাল হবার পেছনে অন্য কোন কারণ নেই বরং যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এসব জিনিসের মালিক তিনি নিজের দাসদের জন্য এ জিনিসটি ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন বলেই এটি হালাল। তাই কুরআন মজীদ সর্বোচ্চ বলিষ্ঠতা সহকারে এ মূলনীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, কোন বস্তুর হালাল ও হারাম হবার জন্য সর্বশক্তিমান প্রভু আল্লাহর অনুমোদন ও অননুমোদন ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন ভিত্তির আদৌ কোন প্রয়োজন নেই। অনুরূপভাবে আল্লাহ যে কাজটিকে বৈধ গণ্য করেছেন সেটি বৈধ এবং যেটিকে অবৈধ গণ্য করেছেন সেটি অবৈধ, এ ছাড়া মানুষের জন্য কোন কাজের বৈধ ও অবৈধ হবার দ্বিতীয় কোন মানদণ্ড নেই।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحِلُّوا۟ شَعَـٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَـٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَـَٔانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا۟ ۘ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿٢﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর আনুগত্য ও ভক্তির নিদর্শনগুলোর অমর্যাদা করো না।[৫] *হারাম মাসগুলোর কোনটিকে হালাল করে নিয়ো না। কুরবানীর পশুগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। যেসব পশুর গলায় আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত হবার আলামত স্বরূপ পট্টি বাঁধা থাকে তাদের ওপরও হস্তক্ষেপ করো না। আর যারা নিজেদের রবের অনুগ্রহ ও তাঁর সন্তুষ্টির সন্ধানে সম্মানিত গৃহের (কাবা) দিকে যাচ্ছে তাদেরকেও উত্যক্ত করো না।*[৬] *হাঁ, ইহরামের অবস্থা শেষ হয়ে গেলে অবশ্যি তোমরা শিকার করতে পারো।*[৭] *আর দেখো, একটি দল তোমাদের জন্য মসজিদুল হারামের পথ বন্ধ করে দিয়েছে, এ জন্য তোমাদের ক্রোধ যেন তোমাদেরকে এতখানি উত্তেজিত না করে যে, তাদের বিরুদ্ধে তোমরা অবৈধ বাড়াবাড়ি করতে শুরু কর।*[৮] *নেকী ও আল্লাহভীতির সমস্ত কাজে সবার সাথে সহযোগিতা করো এবং গুনাহ ও সীমালংঘনের কাজে কাউকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় করো। তাঁর শাস্তি বড়ই কঠোর।*

৫. যে জিনিসটি কোন আকীদা–বিশ্বাস, মতবাদ, চিন্তাধারা, কর্মনীতি বা কোন ব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করে তাকে তার "শেআ'র'' বলা হয়। কারণ সেটি তার আলামত, নিদর্শন বা চিহ্নের কাজ করে। সরকারী পতাকা, সেনাবাহিনী ও পুলিশ প্রভৃতির ইউনিফরম, মুদ্রা, নোট ও ডাকটিকিট সরকারের "শেআ'র" বা নিশানীর অন্তরভুক্ত। সরকার নিজের বিভিন্ন বিভাগের কাছে বরং তার অধীনস্থ সকলের কাছে এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের দাবী জানায়। গীর্জা, ফাঁসির মঞ্চ ও ক্রুশ খৃষ্টবাদের শেআ'র বা নিশানী। টিকি, পৈতা ও মন্দির ব্রাহ্মণ্যবাদের নিশানী। ঝুঁটি বাঁধা চুল, হাতের বালা ও কৃপাণ ইত্যাদি শিখ ধর্মের নিশানী। হাতুড়ি ও কাস্তে সমাজতন্ত্রের নিশানী। স্বস্তিকা আর্য বংশ–পূজার নিশানী। এ ধর্ম বা মতবাদগুলো তাদের নিজেদের অনুসারীদের কাছে এ নিদর্শনগুলোর প্রতি মর্যাদা

প্রদর্শনের দাবী করে। যদি কোন ব্যক্তি কোন ব্যবস্থার নিশানীসমূহের মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা করে, তাহলে এটি মূলত তার ঐ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করার আলামত হিসেবে বিবেচিত হয়। আর ঐ অবমাননাকারী নিজে যদি ঐ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত হয়, তাহলে তার এ কাজটি তার নিজের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার সমার্থক বলে গণ্য হয়।

"শাআইর" হচ্ছে "শে'আর" শব্দের বহুবচন। "শাআইরুল্লাহ" বলতে এমন সব আলামত বা নিশানী বুঝায় যা শিরক, কুফরী ও নাস্তিক্যবাদের পরিবর্তে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য সূচক মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। এ ধরনের আলামত ও চিহ্ন যেখানে যে মতবাদ ও ব্যবস্থার মধ্যে পাওয়া যাবে, প্রত্যেক মুসলমানকে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে সেখানে শর্ত হচ্ছে তাদের মনস্তাত্বিক পটভূমিতে নির্ভেজাল আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের মানসিকতা বিরাজ করা চাই এবং সকল প্রকার মুশরিকী ও কুফরী চিন্তার মিশ্রণ থেকে তাদের মুক্ত হওয়া চাই। কোন ব্যক্তি, সে কোন অমুসলিম হলেও, যদি তার নিজের বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে এক আল্লাহর আরাধনা ও ইবাদাতের কোন অংশ থেকে থাকে তাহলে অন্তত সেই অংশে মুসলমানদের উচিত তার সাথে একাত্ম হওয়া এবং সেই অধ্যায়ে তার যে সমস্ত "শে'আর" নির্ভেজাল আল্লাহর ইবাদাত উপসনার আলামত হিসেবে বিবেচিত হবে সেগুলোর প্রতিও পূর্ণ মর্যাদা প্রদর্শন করা। এ বিষয়ে তার ও আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই বরং সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্য আছে। সে আল্লাহর বন্দেগী করে কেন, এটা বিরোধের বিষয় নয়। বরং বিরোধের বিষয় হচ্ছে এই যে, আল্লাহর বন্দেগীর সাথে সে অন্য কিছুর বন্দেগীর মিশ্রণ ঘটাচ্ছে কেন?

মনে রাখতে হবে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এ নির্দেশ এমন এক সময় দেয়া হয়েছিল যখন আরবে মুসলমান ও মুশরিকদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। মক্কা ছিল মুশরিকদের দখলে। আরবের প্রত্যক এলাকা থেকে মুশরিক গোত্রের লোকেরা হজ্জ ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কাবাগৃহের দিকে আসতো। এ জন্য অনেক গোত্রকে মুসলমানদের এলাকা অতিক্রম করতে হতো। তখন মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তারা মুশরিক হলেও এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করলেও তারা যখন আল্লাহর ঘরের দিকে যাচ্ছে তখন তাদেরকে বাধা দিয়ো না। হজ্জের মাসগুলোয় তাদের ওপর আক্রমণ করো না এবং আল্লাহর সমীপে নজরানা পেশ করার জন্য যে পশুগুলো তারা নিয়ে যাচ্ছে সেগুলোর ওপর হস্তক্ষেপ করো না। কারণ তাদের বিকৃত ধর্মে আল্লাহর আরাধনার যতটুকু অংশ বাকি রয়ে গেছে তা অবশ্যি সম্মান লাভের যোগ্য, অসম্মান লাভের নয়।

৬. আল্লাহর নিশানীসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সাধারণ নির্দেশ দেবার পর কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কারণ তৎকালীন যুদ্ধাবস্থার দরুন মুসলমানদের হাতে ঐগুলোর অবমাননা হবার আশংকা দেখা দিয়েছিল। এ কয়েকটি নিশানীর নাম উল্লেখ করার অর্থ এ নয় যে, কেবল এ ক'টিই মর্যাদা লাভের যোগ্য।

৭. ইহ্‌রামও আল্লাহর একটি অন্যতম নিশানী। এ ব্যাপারে যে বিধিনিষেধগুলো আরোপিত হয়েছে তার মধ্য থেকে কোন একটি ভংগ করার অর্থই হচ্ছে ইহ্‌রামের

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে মৃতজীব[৯], রক্ত, শূকরের গোশ্ত, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর নামে যবেহকৃত জীব[১০] এবং কন্ঠরুদ্ধ হয়ে, আহত হয়ে, ওপর থেকে পড়ে গিয়ে বা ধাক্কা খেয়ে মরা অথবা কোন হিংস্র প্রাণী চিরে ফেলেছে এমন জীব, তোমরা জীবিত পেয়ে যাকে যবেহ করে দিয়েছো সেটি ছাড়া।[১১] আর যা কোন বেদীমূলে[১২] যবেহ করা হয়েছে তাও তোমাদের জন্য হারাম করে দেয়া হয়েছে।[১৩] এ ছাড়াও শর নিক্ষেপের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য নির্ণয় করাও তোমাদের জন্য জায়েয নয়।[১৪] এগুলো ফাসেকীর কাজ। আজ তোমাদের দীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে। কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো।[১৫] আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছি, আমার নিয়ামত তোমাদের প্রতি সম্পূর্ণ করেছি এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছি (কাজেই তোমাদের ওপর হালাল ও হারামের যে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে তা মেনে চলো।)[১৬] তবে যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার জ্বালায় বাধ্য হয়ে ঐগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি জিনিস খেয়ে নেয় গুনাহের প্রতি কোন আকর্ষণ ছাড়াই, তাহলে নিসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[১৭]

অবমাননা করা। তাই আল্লাহর নিশানী প্রসংগে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, যতক্ষণ তোমরা ইহ্রাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ শিকার করা আল্লাহর ইবাদাতের নিশানীগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি নিশানীর অবমাননা বুঝাবে। তবে শরীয়াতের বিধি অনুযায়ী ইহ্রামের সীমা খতম হয়ে গেলে তোমাদের শিকার করার অনুমতি আছে।

৮. যেহেতু কাফেররা সে সময় মুসলমানদেরকে কাবা ঘরের যিয়ারতে বাধা দিয়েছিল এবং আরবের প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধাচরণ করে মুসলমানদেরকে হজ্জ থেকেও বঞ্চিত করেছিল, তাই মুসলমানদের মনে এ চিন্তার উদয় হলো যে, যেসব কাফের গোত্রকে কাবা যাবার জন্য মুসলিম অধ্যুসিত এলাকার কাছ দিয়ে যেতে হয়, তাদের হজ্জযাত্রার পথ তারা বন্ধ করে দেবে এবং হজ্জের মওসুমে তাদের কাফেলার ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাবে। কিন্তু এ আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাদেরকে এ সংকল্প থেকে বিরত রাখলেন।

৯. অর্থাৎ যে পশুর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

১০. অর্থাৎ যাকে যবেহ করার সময় আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়া হয়। অথবা যাকে যবেহ করার আগে এ মর্মে নিয়েত করা হয় যে, অমুক মহাপুরুষ অথবা অমুক দেবী বা দেবতার নামে উৎসর্গীত। (সূরা বাকারার ১৭১ টীকা দেখুন)।

১১. অর্থাৎ যে প্রাণীটি উপরোক্ত দুর্ঘটনাগুলোর শিকার হবার পরও মরেনি। বরং তার মধ্যে জীবনের কিছু আলামত পাওয়া যায়। তাকে যবেহ করলে তার গোশ্‌ত খাওয়া যেতে পারে। এ থেকে একথাও জানা যায় যে, হালাল প্রাণীর গোশ্‌ত একমাত্র যবেহর মাধ্যমে হালাল হয়। একে হালাল করার আর দ্বিতীয় কোন সঠিক পথ নেই। এ 'যবেহ' ও 'যাকাত' ইসলামের একটি বিশেষ পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, গলার এতখানি অংশ কেটে দেয়া যার ফলে শরীরের সমস্ত রক্ত ভালভাবে বের হয়ে যেতে পারে। এক কোপে কেটে বা গলায় ফাঁস দিয়ে অথবা অন্য কোনভাবে প্রাণী হত্যা করলে যে ক্ষতিটা হয় তা হচ্ছে এই যে, এর ফলে রক্তের বেশীর ভাগ অংশ তার শরীরের মধ্যে আটকে যায় এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমে গিয়ে তা গোশ্‌তের সাথে মিশে যায়। অন্য দিকে যবেহ করলে মস্তিষ্কের সাথে শরীরের সম্পর্ক দীর্ঘ সময় বজায় থাকে। এর ফলে প্রতিটি শিরা উপশিরা থেকে রক্ত নিংড়ে বেরিয়ে আসে। এভাবে সারা দেহের গোশ্‌ত রক্তশূন্য হয়ে যায়। রক্ত হারাম একথা আগেই বলা হয়েছে। কাজেই গোশ্‌তের পাক ও হালাল হবার জন্য অবশ্যি তার পুরোপুরি রক্তশূন্য হওয়া অপরিহার্য।

১২. আসলে 'নুসুব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ থেকে এমন সব স্থান বুঝায় যেগুলোকে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে বলিদান ও নজরানা পেশ করার জন্য নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। সেখানে কোন পাথর বা কাঠের মূর্তি থাক বা না থাক তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের ভাষায় এরি সমার্থবোধক শব্দ হচ্ছে বেদী বা 'আস্তানা'। কোন মহাপুরুষ, কোন দেবতা বা মুশরিকী আকীদার সাথে এ স্থানটি জড়িত থাকে।

১৩. এখানে একথাটি ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, পানাহারযোগ্য দ্রব্যাদির মধ্যে শরীয়াত যেগুলোকে হালাল ও হারাম বলে দিয়েছে সেগুলোর হালাল ও হারাম হবার মূল ভিত্তি তাদের ভেষজ উপকারিতা ও অনুপকারিতা নয়। বরং তাদের নৈতিক লাভ ও ক্ষতিই এর ভিত্তি। প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে আল্লাহ মানুষের নিজের প্রচেষ্টা, সাধনা, অনুসন্ধান ও গবেষণার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। জীব ও জড় পদার্থগুলোর মধ্যে কোন্‌টি মানুষের দেহে সুখাদ্যের যোগান দিতে পারে এবং কোন্‌টি খাদ্য হিসেবে তার জন্য ক্ষতিকর ও অনুপকারী তা উদ্ভাবন ও নির্ণয় করার দায়িত্ব মানুষের নিজের ওপর বর্তায়। এসব বিষয়ে তাকে পথনির্দেশ দেবার দায়িত্ব শরীয়াত নিজের কাঁধে তুলে নেয়নি। এ

দায়িত্ব যদি শরীয়াত নিজের কাঁধে তুলে নিতো তাহলে সর্বপ্রথম 'বিষ' হারাম বলে ঘোষণা করতো। কিন্তু আমরা দেখি কুরআন ও হাদীসের কোথাও এর অথবা মানুষের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর অন্যান্য মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের আদৌ কোন উল্লেখই নেই। শরীয়াত খাদ্যের ব্যাপারে যে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে তা হচ্ছে এই যে, কোন্ খাদ্যটি মানুষের নৈতিকতার ওপর কি প্রভাব বিস্তার করে, আত্মার পবিত্রতার জন্য কোন্ খাদ্যটি কোন্ পর্যায়ভুক্ত এবং খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতিগুলোর মধ্য থেকে কোন্ পদ্ধতিটি বিশ্বাস ও প্রকৃতিগত দিক দিয়ে ভুল বা নির্ভুল? যেহেতু এ ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাবার সাধ্য মানুষের নেই এবং এ অনুসন্ধান চালাবার জন্য যে উপায় উপকরণের প্রয়োজন তাও মানুষের আয়ত্বের বাইরে, আর এ জন্যই এসব ব্যাপারে মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভুল করে বসেছে, তাই শরীয়াত কেবলমাত্র এসব বিষয়েই তাকে পথনির্দেশ দেয়। যেগুলোকে সে হারাম গণ্য করেছে, সেগুলোকে হারাম করার কারণ হচ্ছে এই যে, মানুষের নৈতিক বৃত্তির ওপর সেগুলোর খারাপ প্রভাব পড়ে বা সেগুলো তাহারাত ও পবিত্রতা বিরোধী অথবা কোন খারাপ আকীদার সাথে সেগুলোর সম্পর্ক রয়েছে। পক্ষান্তরে যে জিনিসগুলোকে শরীয়াত হালাল গণ্য করেছে সেগুলোর হালাল হবার কারণ হচ্ছে এই যে, উপরোল্লিখিত দোষগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি দোষেও সেগুলো দুষ্ট নয়।

প্রশ্ন করা যেতে পারে, এ জিনিসগুলোর হারাম হবার কারণ আল্লাহ আমাদের বুঝাননি কেন? কারণ বুঝিয়ে দিলে তো আমরা যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারতাম। এর জবাব হচ্ছে, আমাদের পক্ষে ঐ কারণগুলো অনুধাবন করা সম্ভব নয়। যেমন রক্ত, শূকরের গোশ্ত বা মৃত জীব খেলে আমাদের নৈতিক বৃত্তিতে কোন্ ধরনের দোষ, কতটুকু এবং কি পরিমাণে দেখা দেয়, সে সম্পর্কে কোন প্রকার অনুসন্ধান চালাবার কোন ক্ষমতাই আমাদের নেই। কারণ নৈতিকতা পরিমাপ করার কোন উপকরণই আমাদের আয়ত্বাধীন নয়। ধরুন যদি এদের খারাপ প্রভাব বর্ণনা করে দেয়াও হতো, তাহলেও সংশয় পোষণকারীরা প্রায় সে একই জায়গায় থাকতেন যেখানে বর্তমানে অবস্থান করছেন। কারণ এ বর্ণনা ভুল না নির্ভুল, তা সে পরিমাপ করবে কিসের সাহায্যে? তাই মহান আল্লাহ হালাল ও হারামের সীমানা মেনে চলাকে ঈমানের ওপর নির্ভরশীল করে দিয়েছেন। যে ব্যক্তি মেনে নেবে যে, কুরআন আল্লাহরই কিতাব, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহরই রসূল এবং আল্লাহকে সর্বজ্ঞ ও সবচেয়ে জ্ঞানী ও কুশলী বলে স্বীকার করবে সে তাঁর নির্ধারিত সীমানা অবশ্যই মেনে চলবে। এর কারণ বোধগম্য হোক বা না হোক তার পরোয়া সে করবে না। আর যে ব্যক্তি এ মৌলিক আকীদাটির ব্যাপারেই নিসংশয় নয় তার জন্য যেসব জিনিসের ক্ষতিকর বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়েছে কেবল মাত্র সেগুলো থেকে দূরে থাকা এবং যেগুলোর ক্ষতিকর বিষয় মানুষের জ্ঞানে ধরা পড়তে পারেনি সেগুলোর ক্ষতির দুর্ভোগ পোহাতে থাকা ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই।

১৪. এ আয়াতে যে জিনিসটি হারাম করা হয়েছে দুনিয়ায় তার তিনটি সংস্করণ প্রচলিত আছে। আয়াতে ঐ তিনটিকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

এক ঃ মুশরিকদের মতো করে 'ফাল' গ্রহণ করা। এতে কোন বিষয়ে দেব-দেবীর কাছে ভাগ্যের ফায়সালা জানার জন্য জিজ্ঞেস করা হয় অথবা গায়েবের—অজানার ও

অদৃশ্যের খবর জিজ্ঞেস করা হয় বা পারস্পরিক বিবাদ মীমাংসা করে নেয়া হয়। মক্কার মুশরিকরা কাবা ঘরে রক্ষিত 'হুবল' দেবতার মূর্তিকে এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছিল। তার বেদীমূলে সাতটি তীর রাখা হয়েছিল। সেগুলোর গায়ে বিভিন্ন শব্দ ও বাক্য খোদাই করা ছিল। কোন কাজ করার বা না করার প্রশ্নে দোদুল্যমানতা দেখা দিলে, হারানো জিনিসের সন্ধান লাভ করতে চাইলে বা হত্যা মামলার ফায়সালা জানতে চাইলে, মোট কথা যেকোন কাজের জন্যই হুবল–এর তীর রক্ষকের কাছে যেতে হতো, সেখানে নজরানা পেশ করতে হতো এবং হুবল–এর কাছে এ মর্মে প্রার্থনা করা হতো, "আমাদের এ ব্যাপারটির ফায়সালা করে দিন।" এরপর তীর রক্ষক তার কাছে রক্ষিত তীরগুলোর সাহায্যে 'ফাল' বের করতো। এতে যে তীরটিই বের হয়ে আসতো, তার গায়ে লিখিত শব্দকেই হুবল–এর ফায়সালা মনে করা হতো।

দুই ঃ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ফাল গ্রহণ। এ ক্ষেত্রে চিন্তা–ভাবনা ও জ্ঞান–বুদ্ধির সাহায্যে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ের মীমাংসার পরিবর্তে কোন প্রকার কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা–কল্পনা বা কোন আকস্মিক ঘটনার মাধ্যমে কোন বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। অথবা এমন সব উপায়ে ভাগ্যের অবস্থা জানবার চেষ্টা করা হয়, যেগুলো গায়েব জানার উপায় হিসেবে কোন তাত্বিক পদ্ধতিতে প্রমাণিত নয়। হস্তরেখা গণনা, নক্ষত্র গণনা, রমল করা, বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার এবং নানা ধরনের ফাল বের করা এর অন্তরভুক্ত।

তিন ঃ জুয়া ধরনের যাবতীয় খেলা ও কাজ। যেখানে অধিকার, কর্মমূলক অবদান ও বুদ্ধিবৃত্তিক ফায়সালার মাধ্যমে বস্তু বন্টনের পদ্ধতি গ্রহণ না করে নিছক কোন ঘটনা–ক্রমিক কার্যক্রমের ভিত্তিতে বস্তু বন্টন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন, লটারীতে ঘটনাক্রমে অমুক ব্যক্তির নাম উঠেছে, কাজেই হাজার হাজার ব্যক্তির পকেট থেকে বের হয়ে আসা টাকা তার একার পকেটে চলে যাবে। অথবা তাত্বিক দিক দিয়ে কোন একটি ধাঁধার একাধিক উত্তর হতে পারে কিন্তু পুরস্কারটি পাবে একমাত্র সেই ব্যক্তি যার উত্তর কোন যুক্তিসংগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে নয় বরং নিছক ঘটনাক্রমে ধাঁধা প্রতিযোগিতা পরিচালকের সিন্ধুকে রক্ষিত উত্তরটির সাথে মিলে যাবে।

এ তিন ধরনের ফাল গ্রহণ ও অনুমানভিত্তিক লটারী করাকে হারাম ঘোষণা করার পর ইসলাম 'কুরআ' নিক্ষেপ বা লটারী করার একমাত্র সহজ সরল পদ্ধতিটিকেই বৈধ গণ্য করেছে। এ পদ্ধিতিতে দু'টি সমান বৈধ কাজের বা দু'টি সমপর্যায়ের অধিকারের মধ্যে ফায়সালা করার প্রশ্ন দেখা দেয়। যেমন, একটি জিনিসের ওপর দু' ব্যক্তির অধিকার সবদিক দিয়ে একদম সমান এবং ফায়সালাকারীর জন্য দু'জনের কাউকে অগ্রাধিকার দেবার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই আর তাদের দু'জনের মধ্য থেকে কোন একজন নিজের অধিকার প্রত্যাহার করতেও প্রস্তুত নয়। এ অবস্থায় তাদের সম্মতিক্রমে লটারীর মাধ্যমে ফায়সালা করা যেতে পারে অথবা দু'টি একই ধরনের সঠিক ও জায়েয কাজ। যুক্তির মাধ্যমে তাদের কোন একটিকে অগ্রাধিকার দেবার ব্যাপারে এক ব্যক্তি দোটানায় পড়ে গেছে। এ অবস্থায় প্রয়োজন হলে লটারী করা যেতে পারে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে যখন দু'জন সমান হকদারের মধ্যে একজনকে প্রাধান্য দেবার প্রশ্ন দেখা দিতো এবং তাঁর আশংকা হতো যে, তিনি একজনকে প্রাধান্য দিলে তা অন্যজনের মনোকষ্টের কারণ হবে তখন তিনি সাধারণত এ পদ্ধতিটি অবলম্বন করতেন।

১৫. 'আজ' বলতে কোন বিশেষ দিন, ক্ষণ বা তারিখ বুঝানো হয়নি বরং যে যুগে ও যে সময়ে এ আয়াত নাযিল হয় সেই সময়কালকে বুঝানো হয়েছে। আমাদের ভাষায়ও 'আজ' শব্দটি একইভাবে সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"তোমাদের দীনের ব্যাপারে কাফেররা পুরোপুরি নিরাশ হয়ে পড়েছে।"—অর্থাৎ তোমাদের দীন এখন একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে এবং সে তার নিজস্ব শাসন ও কর্তৃত্ব ক্ষমতার জোরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কাফেররা এতদিন তার পথে বাধা ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আসছিল। কিন্তু এখন তারা এ দীনকে ধ্বংস করার এবং তোমাদেরকে আবার জাহেলিয়াতের অন্ধকার গর্ভে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে পড়েছে। "কাজেই তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, আমাকে ভয় করো।" অর্থাৎ এ দীনের বিধান এবং এর হেদায়াত কার্যকর করার ব্যাপারে এখন তোমাদের আর কোন কাফের শক্তির প্রভাব, পরাক্রম, প্রতিবন্ধকতা, প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপের সম্মুখীন হতে হবে না। এখন আর মানুষকে ভয় করার কেন কারণ নেই। তোমাদের এখন আল্লাহকে ভয় করা উচিত। আল্লাহর বিধান কার্যকর করার ব্যাপারে এখন যদি তোমরা কোন ত্রুটি করো তাহলে এ জন্য তোমাদের কাছে এমন কোন ওজর থাকবে না যার ভিত্তিতে তোমাদের সাথে কোমল ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন আর শরীয়াতের বিরুদ্ধাচরণের অর্থ এ হবে না যে, এ ব্যাপারে তোমরা অন্যদের প্রভাবে বাধ্য হয়ে এমনটি করেছো। বরং এর পরিষ্কার অর্থ হবে, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করতে চাও না।

১৬. দীনকে পরিপূর্ণ করে দেবার অর্থই হচ্ছে তাকে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা ও কর্ম ব্যবস্থা এবং একটি পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ব্যবস্থায় পরিণত করা হয়েছে। তার মধ্যে জীবনের সমস্ত প্রশ্নের নীতিগত বা বিস্তারিত জবাব পাওয়া যায়। হেদায়াত ও পথনির্দেশ লাভ করার জন্য এখন আর কোন অবস্থায়ই তার বাইরে যাবার প্রয়োজন নেই। নিয়ামত সম্পূর্ণ করে দেবার অর্থ হচ্ছে, হেদায়াতের নিয়ামত পূর্ণ করা। আর ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করে নেবার অর্থ হচ্ছে এই যে, তোমরা আমার আনুগত্য ও বন্দেগী করার যে অংগীকার করেছিলে তাকে যেহেতু তোমরা নিজেদের প্রচেষ্টা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য ও আন্তরিক অংগীকার হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছো, তাই আমি তাকে গ্রহণ করে নিয়েছি এবং তোমাদেরকে কার্যত এমন অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছি যে, এখন তোমাদের গলায় প্রকৃতপক্ষে আমার ছাড়া আর কারোর আনুগত্য ও বন্দেগীর শৃংখল নেই। এখন আকীদা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে যেমন তোমরা আমার মুসলিম (আনুগত্যকারী) ঠিক তেমনি কর্মজীবনেও আমার ছাড়া আর কারোর মুসলিম (আনুগত্যকারী) হয়ে থাকতে তোমরা কোনক্রমেই বাধ্য নও। এ অনুগ্রহগুলোর কথা উচ্চারণ করার পর মহান আল্লাহ নীরবতা অবলম্বন করেছেন। কিন্তু এ বাক পদ্ধতি থেকে একথা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ফুটে ওঠে, যেন এখানে আল্লাহ বলতে চাচ্ছেন, আমি যখন তোমাদের ওপর এ অনুগ্রহগুলো করেছি তখন এর দাবী হচ্ছে, এখন আমার আইনের সীমার মধ্যে অবস্থান করার ব্যাপারে তোমাদের পক্ষ থেকে যেন আর কোন ত্রুটি দেখা না দেয়।

বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এ আয়াতটি বিদায় হজ্জের সময় ১০ হিজরীতে নাযিল হয়েছিল। কিন্তু যে বক্তব্যের ধারাবাহিকতার সাথে এর সম্পর্ক তা ৬ হিজরীতে হোদাইবিয়া চুক্তির সমসাময়িক কালের। বর্ণনা রীতির কারণে বাক্য দু'টি পরস্পর

يَسْئَلُوْنَكَ مَاذَآ اُحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلْ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِيْنَ تُعَلِّمُوْنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللّٰهُ ۫ فَكُلُوْا مِمَّآ اَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ ④

লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, তাদের জন্য কি হালাল করা হয়েছে? বলে দাও, তোমাদের জন্য সমস্ত পাক–পবিত্র জিনিস হালাল করা হয়েছে।[১৮] আর যেসব শিকারী প্রাণীকে তোমরা শিক্ষিত করে তুলেছো, যাদেরকে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করা শিখিয়েছো, তারা তোমাদের জন্য যেসব প্রাণী ধরে রাখে, তাও তোমরা খেতে পারো।[১৯] তবে তার ওপর আল্লাহর নাম নিতে হবে।[২০] আর আল্লাহর আইন ভাঙ্গার ব্যাপারে সাবধান। অবশ্যি হিসেব নিতে আল্লাহর মোটেই দেরী হয় না।

এমনভাবে মিশে গেছে যার ফলে কোন ক্রমেই ধারণা করা যাবে না যে, শুরুতে এ বাক্যগুলো ছাড়াই এ ধরাবাহিক বক্তব্যটি নাযিল হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে এ বাক্যগুলো নাযিল হবার পর তা এখানে এনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। অবশ্য প্রকৃত ব্যাপার একমাত্র আল্লাহই জানেন, তবে আমার অনুমান, প্রথমে এ আয়াতটি এ একই প্রসংগে নাযিল হয়েছিল। তাই লোকেরা তখন এর আসল গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারেনি। পরে যখন সমগ্র আরব ভূখণ্ড বিজিত হলো এবং ইসলাম শক্তি অর্জন করে পূর্ণ যৌবনে পৌছে গেলো তখন মহান আল্লাহ পুনর্বার এ বাক্য তাঁর নবীর প্রতি নাযিল করেন এবং এটি ঘোষণা করে দেবার নির্দেশ জারি করেন।

১৭. সূরা বাকারার ১৭২ টীকা দেখুন।

১৮. এ জবাবের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম তত্ব নিহিত রয়েছে। ধর্মীয় ভাবাপন্ন লোকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এমন এক মানসিকতার শিকার হন যার ফলে তারা কোন জিনিসকে সুস্পষ্টভাবে হালাল গণ্য না করা পর্যন্ত দুনিয়ার সব জিনিসকেই হারাম গণ্য করে থাকেন। এ মানসিকতার ফলে মানুষের ওপর সন্দেহ প্রবণতা ও আইনের গৎবাঁধা রীতি চেপে বসে। জীবনের প্রত্যেকটি কাজে সে হালাল বস্তু ও জায়েয কাজের তালিকা চেয়ে বেড়ায় এবং প্রত্যেকটি কাজ ও প্রত্যেকটি জিনিসকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে, যেন সব কিছুই নিষিদ্ধ। এখানে কুরআন এ মানসিকতার সংশোধন করছে। প্রশ্নকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, সমস্ত হালাল জিনিসের বিস্তারিত বিবরণ তাদের জানিয়ে দিতে হবে, যাতে তারা সেগুলো ছাড়া অন্য সব জিনিসকে হারাম মনে করতে পারে। জবাবে কুরআন হারাম জিনিসগুলো বিস্তারিতভাবে বলে দিয়েছে এবং এরপর সমস্ত পাক পবিত্র জিনিস হালাল, এ সাধারণ নির্দেশ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। এভাবে পুরাতন ধর্মীয় মতাদর্শ সম্পূর্ণ রূপে উল্টে গেছে। পুরাতন মতাদর্শ অনুযায়ী সবকিছুই ছিল হারাম কেবলমাত্র যেগুলোকে হালাল গণ্য

করা হয়েছে সেগুলো ছাড়া। কুরআন এর বিপরীত পক্ষে এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, সবকিছুই হালাল কেবল মাত্র সেগুলো ছাড়া যেগুলোর হারাম হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। এটি ছিল একটি অনেক বড় সংশোধন। মানুষের জীবনকে বাঁধন মুক্ত করে এ সংশোধন প্রশস্ত দুনিয়ার দুয়ার তার জন্য খুলে দিয়েছে। প্রথমে একটি গণ্ডীবদ্ধ ক্ষুদ্র পরিসরের কিছু জিনিস ছিল তার জন্য হালাল, বাকি সমস্ত দুনিয়া ছিল তার জন্য হারাম। আর এখন একটি গণ্ডিবদ্ধ পরিসরের কিছু জিনিস তার জন্য হারাম বাদবাকি সমস্ত দুনিয়াটাই তার জন্য হালাল হয়ে গেছে।

হালালের জন্য "পাক–পবিত্রতার" শর্ত আরোপ করা হয়েছে, যাতে এ সাধারণ বৈধতার দলীলের মাধ্যমে নাপাক জিনিসগুলোকে হালাল গণ্য করার চেষ্টা না করা হয়। এখন কোন জিনিসের "পাক–পবিত্র" হবার বিষয়টি কিভাবে নির্ধারিত হবে, এ প্রশ্নটি থেকে যায়। এর জবাব হচ্ছে, যেসব জিনিস শরীয়াতের মূলনীতিগুলোর মধ্য থেকে কোন একটি মূলনীতির আওতায় নাপাক গণ্য হয় অথবা ভারসাম্যপূর্ণ রুচিশীলতা যেসব জিনিস অপছন্দ করে বা ভদ্র ও সংস্কৃতিবান মানুষ সাধারণত যেসব জিনিসকে নিজের পরিচ্ছন্নতার অনুভূতির বিরোধী মনে করে থাকে সেগুলো ছাড়া বাকি সবকিছুই পাক।

১৯. শিকারী প্রাণী বলতে বাঘ, সিংহ, বাজ পাখি, শিকরা ইত্যাদি এমনসব পশু–পাখি বুঝায় যাদেরকে মানুষ শিকার করার কাজে নিযুক্ত করে। শিক্ষিত পশু–পাখির বৈশিষ্ট হচ্ছে এই যে, তারা যা কিছু শিকার করে সাধারণ পশু–পাখির মতো তাদেরকে ছিঁড়ে ফেড়ে খেয়ে ফেলে না বরং নিজের মালিকের জন্য রেখে দেয়। তাই সাধারণ পশু–পাখির শিকার করা প্রাণী হারাম কিন্তু শিক্ষিত পশু–পাখির শিকার করা প্রাণী হালাল।

এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে কিছুটা মতবিরোধ আছে। এক দলের মতে, শিকারী পশু–পাখি তার শিকার করা প্রাণী থেকে যদি কিছুটা খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে। কারণ তার খাওয়া প্রমাণ করে যে, শিকারটিকে সে মালিকের জন্য নয়, নিজের জন্য ধরেছে। ইমাম শাফেঈ এ মত অবলম্বন করেছেন। দ্বিতীয় দলের মতে, সে যদি তার শিকার করা প্রাণীর কিছুটা খেয়ে নেয় তাহলেও তা হারাম হয়ে যায় না। এমনকি এক–তৃতীয়াংশ পর্যন্ত খেয়ে নিলেও বাকি দু'–তৃতীয়াংশ হালালই থেকে যাবে। আর এ ব্যাপারে পশু ও পাখির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ইমাম মালেক এ মত অবলম্বন করেছেন। তৃতীয় দলের মতে, শিকারী পশু যদি তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে কিন্তু যদি শিকারী পাখি তার শিকার থেকে কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তা হারাম হয়ে যাবে না। কারণ শিকারী পশুকে এমন শিক্ষা দেয়া যেতে পারে যার ফলে সে শিকার থেকে কিছুই না খেয়ে তাকে মালিকের জন্য সংরক্ষণ করে রাখতে পারে কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, শিকারী পাখিকে এ ধরনের শিক্ষা দেয়া সম্ভব নয়। ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর শাগরিদবৃন্দ এমত অবলম্বন করেছেন। এর বিপরীত পক্ষে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, শিকারী পাখির শিকার আদৌ জায়েয নয়। কারণ শিকারকে নিজে না খেয়ে মালিকের জন্য রেখে দেবার ব্যাপারটি তাকে কোনক্রমেই শেখানো সম্ভব নয়।

২০. অর্থাৎ শিকারী পশুকে শিকারের পেছনে লেলিয়ে দেবার সময় "বিসমিল্লাহ" বলো। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু আনহু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

اَلْيَوْمَ اُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ ؕ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ ۪ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۫ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنٰتِ وَالْمُحْصَنٰتُ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ مُحْصِنِيْنَ غَيْرَ مُسٰفِحِيْنَ وَلَا مُتَّخِذِيْۤ اَخْدَانٍ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهٗ ۫ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ۝

আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পাক–পবিত্র বস্তু হালাল করে দেয়া হয়েছে। আহ্‌লি কিতাবদের খাদ্য তোমাদের জন্য হালাল এবং তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য হালাল।[২১] আর সংরক্ষিত মেয়েরা তোমাদের জন্য হালাল, তারা ঈমানদারদের দল থেকে হোক বা এমন জাতিদের মধ্য থেকে হোক, যাদেরকে তোমাদের আগে কিতাব দেয়া হয়েছিল।[২২] তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের মোহরানা আদায় করে দিয়ে বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে তাদের রক্ষক হবে। তোমরা অবাধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারবে না অথবা লুকিয়ে লুকিয়ে প্রেম করতেও পারবে না। আর যে ব্যক্তি ঈমানের পথে চলতে অস্বীকার করবে, তার জীবনের সকল সৎকার্যক্রম নষ্ট হয়ে যাবে এবং আখেরাতে সে হবে নিঃস্ব ও দেউলিয়া।[২৩]

ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি কি কুকুরের সাহায্যে শিকার করতে পারি?' জবাবে তিনি বলেন ঃ "যদি তাকে ছাড়ার সময় তুমি "বিসমিল্লাহ" বলে থাকো, তাহলে তা খেয়ে নাও অন্যথায় খেয়ো না। আর যদি সে শিকার থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে থাকে, তাহলে তা খেয়ো না। কারণ সে শিকারকে আসলে তার নিজের জন্য ধরেছে," তারপর তিনি আবার জিজ্ঞেস করেন ঃ 'আমি যদি শিকারের ওপর নিজের কুকুর ছেড়ে দেবার পর দেখি সেখানে আর একটি কুকুর আছে তাহলে?' তিনি জবাব দিলেন ঃ "এ অবস্থায় ঐ শিকারটি খেয়ো না। কারণ আল্লাহর নাম তুমি নিজের কুকুরের ওপর নিয়েছিলে, অন্য কুকুরটির ওপর নয়?"

এ আয়াত থেকে জানা যায়, শিকারের ওপর শিকারী পশুকে ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম নেয়া জরুরী। এরপর যদি শিকারকে জীবিত পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তাকে যবেহ করতে হবে। আর যদি জীবিত না পাওয়া যায় তাহলে যবেহ

করা ছাড়াই তা হালাল। কারণ শুরুতে শিকারী পশুকে তার ওপর ছাড়ার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়েছিল। তীর দিয়ে শিকার করার ব্যাপারেও এ একই কথা।

২১. আহ্‌লি কিতাবদের খাদ্যের মধ্যে তাদের যবেহকৃত প্রাণীও অন্তরভুক্ত। আমাদের জন্য তাদের এবং তাদের জন্য আমাদের খাদ্য হালাল হবার মানে হচ্ছে এই যে, আমাদের ও তাদের মধ্যে পানাহারের ব্যাপারে কোন বাধ্য বা শুচি–অশুচির ব্যাপার নেই। আমরা তাদের সাথে খেতে পারি এবং তারা আমাদের সাথে খেতে পারে। কিন্তু এভাবে সাধারণ অনুমতি দেবার আগে এ বাক্যটির পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে যে, "তোমাদের জন্য সমস্ত পাক–পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হয়েছে।" এ থেকে জানা গেলো, আহলি কিতাব যদি পাক–পবিত্রতা ও তাহারাতের ব্যাপারে শরীয়াতের দৃষ্টিতে অপরিহার্য বিধানগুলো মেনে না চলে অথবা যদি তাদের খাদ্যের মধ্যে হারাম বস্তু অন্তরভুক্ত থাকে তাহলে তা থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন, যদি তারা আল্লাহর নাম না নিয়েই কোন প্রাণী যবেহ করে অথবা তার ওপর আল্লাহ ছাড়া আর কারোর নাম নেয়, তাহলে তা খাওয়া আমাদের জন্য জায়েয নয়। অনুরূপভাবে যদি তাদের দস্তরখানে মদ, শূকরের গোশ্‌ত বা অন্য কিছু হারাম খাদ্য পরিবেশিত হয়, তাহলে আমরা তাদের সাথে আহারে শরীক হতে পারি না।

আহ্‌লি কিতাবদের ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের ব্যাপারেও এ একই কথা। তবে সেখানে পার্থক্য কেবল এতটুকু যে, আহলি কিতাবদের যবেহ করা প্রাণী জায়েয, যদি তারা যবেহ করার সময় তার ওপর আল্লাহর নাম নিয়ে থাকে কিন্তু আহলি কিতাব ছাড়া অন্যান্য অমুসলিমদের হত্যা করা প্রাণী আমরা খেতে পারি না।

২২. এখানে ইহুদী ও খৃষ্টানদের কথা বলা হয়েছে। কেবলমাত্র তাদের মেয়েদেরকেই বিয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে আর এ সংগে শর্তও আরোপিত হয়েছে যে, তাদের 'মুহসানাত' (সংরক্ষিত মহিলা) হতে হবে। এ নির্দেশটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিরূপণের ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ইবনে আব্বাসের (রা) মতে এখানে আহ্‌লি কিতাব বলতে সে সব আহ্‌লি কিতাবকে বুঝানো হয়েছে যারা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রজা। অন্যদিকে দারুল হারব ও দারুল কুফ্‌রের ইহুদী ও খৃষ্টানদের মেয়েদের বিয়ে করা জায়েয নয়। হানাফী ফকীহগণ এর থেকে সামান্য একটু ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতে বহির্দেশের আহ্‌লি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করা হারাম না হলেও মকরূহ, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব ও হাসান বসরীর মতে, আয়াতটির হুকুম সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কাজেই এখানে যিম্মী ও অযিম্মীর মধ্যে পার্থক্য করার কোন প্রয়োজন নেই। তারপর 'মুহসানাত' শব্দের অর্থের ব্যাপারেও ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হযরত উমরের (রা) মতে, এর অর্থ পবিত্র ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মেয়েরা। মুহসানাত শব্দের এ অর্থ গ্রহণ করার কারণে তিনি আহ্‌লি কিতাবদের স্বেচ্ছাচারী মেয়েদের বিয়ে করাকে এ অনুমতির আওতার বাইরে রেখেছেন। হাসান, শা'বী ও ইব্রাহীম নাখ্‌ঈ (র) এ একই মত পোষণ করেন। হানাফী ফকীহগণও এ মত অবলম্বন করেছেন। অন্যদিকে ইমাম শাফেঈর মতে, এখানে এ শব্দটি ক্রীতদাসীদের মোকাবিলায় ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এখানে এ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, আহলি কিতাবদের এমন সব মেয়ে যারা ক্রীতদাসী নয়।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۚ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝٦

২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্য তৈরী হও, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল ও হাত দু'টি কনুই পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো, মাথার ওপর হাত বুলাও এবং পা দু'টি গেরো পর্যন্ত ধুয়ে ফেলো।[২৪] যদি তোমরা 'জানাবাত' অবস্থায় থাকো, তাহলে গোসল করে পাক সাফ হয়ে যাও।[২৫] যদি তোমরা রোগগ্রস্ত হও বা সফরে থাকো অথবা তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মলমূত্র ত্যাগ করে আসে বা তোমরা নারীদেরকে স্পর্শ করে থাকো এবং পানি না পাও, তাহলে পাক-পবিত্র মাটি দিয়ে কাজ সেরে নাও। তার ওপর হাত রেখে নিজের চেহারা ও হাতের ওপর মসেহ করে নাও।[২৬] আল্লাহ তোমাদের জন্য জীবনকে সংকীর্ণ করে দিতে চান না কিন্তু তিনি চান তোমাদেরকে পাক-পবিত্র করতে এবং তাঁর নিয়ামত তোমাদের ওপর সম্পূর্ণ করে দিতে,[২৭] হয়তো তোমরা শোকর গুজার হবে।

২৩. আহলি কিতাবদের মেয়েদেরকে বিয়ে করার অনুমতি দেবার পর এখানে সতর্কবাণী হিসেবে এ বাক্যটি সন্নিবেশিত হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে ব্যক্তি এ অনুমতি থেকে লাভবান হতে চাইবে সে যেন নিজের ঈমান ও চরিত্রের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে। এমন যেন না হয়, কাফের স্ত্রীর প্রেমে আত্মহারা হয়ে অথবা তার আকীদা ও কর্মকাণ্ডে প্রভাবিত হয়ে তিনি নিজের ঈমানের মূল্যবান সম্পদ হারিয়ে বসেন বা সামাজিক জীবন যাপন ও আচরণের ক্ষেত্রে ঈমান বিরোধী পথে এগিয়ে চলেন।

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِيْ وَاثَقَكُمْ بِهٖۤ اِذْ قُلْتُمْ
سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ز وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿৭﴾
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ ز وَلَا يَجْرِ
مَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰۤى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ز وَاتَّقُوا
اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿৮﴾ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا
الصّٰلِحٰتِ لا لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿৯﴾ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا
بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰۤئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿১০﴾

আল্লাহ তোমাদের যে নিয়ামত দান করেছেন[২৮] তার কথা মনে রাখো এবং তিনি তোমাদের কাছ থেকে যে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছেন তা ভুলে যেয়ো না। অর্থাৎ তোমাদের একথা—"আমরা শুনেছি ও আনুগত্য করেছি।" আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ মনের কথা জানেন। হে ঈমানদারগণ! সত্যের ওপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত ও ইনসাফের সাক্ষদাতা হয়ে যাও।[২৯] কোন দলের শত্রুতা তোমাদেরকে যেন এমন উত্তেজিত না করে দেয় যার ফলে তোমরা ইনসাফ থেকে সরে যাও। ইনসাফ ও ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠিত করো। এটি আল্লাহভীতির সাথে বেশী সামঞ্জস্যশীল। আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ সে সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত আছেন। যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে আল্লাহ তাদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তাদের ভুল-ত্রুটি মাফ করে দেয়া হবে এবং তারা বিরাট প্রতিদান লাভ করবে আর যারা কুফরী করবে এবং আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা বলবে, তারা হবে জাহান্নামের অধিবাসী।

২৪. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হুকুমটির যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়, কুল্লি করা ও নাক সাফ করাও মুখ ধোয়ার অন্তরভুক্ত। এ ছাড়া মুখমণ্ডল ধোয়ার কাজটি কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। আর কান যেহেতু মাথার একটি অংশ তাই মাথা মসেহ করার মধ্যে কানের ভেতরের ও বাইরের উভয় অংশও শামিল হয়ে যায়। তাছাড়া অযু শুরু করার আগে দু' হাত ধুয়ে নেয়া উচিত। কারণ যে হাত দিয়ে অযু করা হচ্ছে সে হাতেরই তো আগে পাক-পবিত্র হবার প্রয়োজন রয়েছে।

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا۟ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ ۖ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١١﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সে অনুগ্রহের কথা স্মরণ করো, যা তিনি (এ সাম্প্রতিককালে) তোমাদের প্রতি করেছেন, যখন একটি দল তোমাদের ক্ষতি করার চক্রান্ত করেছিল কিন্তু আল্লাহ তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন।[৩০] *আল্লাহকে ভয় করে কাজ করতে থাকো। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরই ভরসা করা উচিত।*

২৫. স্ত্রী সহবাসের কারণে 'জানাবাত' হোক বা স্বপ্নে বীর্য স্খলনের কারণে হোক উভয় অবস্থায়ই গোসল ওয়াজিব। এ অবস্থায় গোসল ছাড়া নামায পড়া বা কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আন্ নিসার ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ টীকা দেখুন)।

২৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসার ৬৯ ও ৭০ টীকা।

২৭. আত্মার পবিত্রতা যেমন একটি নিয়ামত ঠিক তেমনি শরীরের পবিত্রতাও একটি নিয়ামত। আর মানুষের ওপর আল্লাহর নিয়ামত তখনই সম্পূর্ণ হতে বা পূর্ণতা লাভ করতে পারবে যখন সে আত্মা ও শরীর উভয়ের তাহারাত ও পাক–পবিত্রতা অর্জনের জন্য পূর্ণ হেদায়াত লাভ করতে সক্ষম হবে।

২৮. অর্থাৎ আল্লাহর এ নিয়ামত যে, জীবনের সরল সঠিক রাজপথ তিনি তোমাদের জন্য আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছেন এবং সারা দুনিয়ার মানুষের হেদায়াত ও নেতৃত্ব দানের আসনে তোমাদের সমাসীন করেছেন।

২৯. সূরা আন নিসার ১৬৪ ও ১৬৫ টীকা দেখুন।

৩০. এখানে একটি বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এ সম্পর্কে রেওয়ায়াত করেছেন ঃ ইহুদীদের একটি দল নবী করীম সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর বিশেষ বিশেষ সাহাবীদেরকে একটি ভোজে আমন্ত্রণ করেছিল। এই সংগে তারা গোপনে চক্রান্ত করেছিল যে, নবী করীম (সা) ও সাহাবীগণ এসে গেলে একযোগে তাদের ওপর আকস্মিকভাবে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে শেষ করে দেবে এবং এভাবে তারা ইসলামের মূলোৎপাটনে সক্ষম হবে। কিন্তু আল্লাহর অনুগ্রহে ঠিক সময়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তিনি দাওয়াতে অংশ গ্রহণ করলেন না। যেহেতু এখান থেকে বনী ইসরাঈলদেরকে

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ⑫

৩ রুকূ'

আল্লাহ বনী ইসরাঈলদের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলেন এবং তাদের মধ্যে বারোজন 'নকীব'[৩১] নিযুক্ত করেছিলেন। আর তিনি তাদেরকে বলেছিলেন ঃ "আমি তোমাদের সাথে আছি। যদি তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত দাও, আমার রসূলদেরকে মানো ও তাদেরকে সাহায্য করো[৩২] এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিতে থাকো,[৩৩] তাহলে নিশ্চিত বিশ্বাস করো আমি তোমাদের থেকে তোমাদের পাপগুলো মোচন করে দেবো[৩৪] এবং তোমাদের এমন সব বাগানের মধ্যে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হবে। কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী নীতি অবলম্বন করবে, সে আসলে 'সাওয়া-উস-সাবীল[৩৫] তথা সরল সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।

সম্বোধন করে বক্তব্য পেশ করা শুরু হয়েছে, তাই ভূমিকা হিসেবে এ ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে।

এখান থেকে যে ভাষণ শুরু হচ্ছে তার উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টো। প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলমানদের পূর্বসূরী আহলি কিতাবরা যে পথে চলছিল সে পথে চলা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। কাজেই তাদেরকে জানিয়ে দেয়া হচ্ছে, যেভাবে আজ তোমাদের থেকে অংগীকার নেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে ইতিপূর্বে বনী ইসরাঈল ও ঈসা আলাইহিস সালামের উম্মতদের থেকেও এ একই অংগীকার নেয়া হয়েছিল। তারা যেভাবে নিজেদের অংগীকার ভংগ করে পথভ্রষ্ট হয়েছে তোমরাও যেন তেমনি অংগীকার ভংগ করে পথভ্রষ্ট হয়ে না যাও। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইহুদী ও খৃষ্টান উভয় সম্প্রদায়কে তাদের ভুলের জন্য সতর্ক করে দেয়া এবং তাদেরকে সত্য দীন তথা ইসলামের দওয়াত দেয়া।

৩১. 'নকীব' অর্থ পর্যবেক্ষক, রক্ষণাবেক্ষণকারী ও তদন্তকারী। বনী ইসরাঈল ছিল বারোটি গোত্রে বিভক্ত। আল্লাহ প্রত্যেক গোত্র থেকে একজনকে নিয়ে সে গোত্রের ওপরই তাকে নকীব নিযুক্ত করার হুকুম দিয়েছিলেন। নকীবের কাজ ছিল তার গোত্রের লোকদের চালচলন ও অবস্থার প্রতি নজর রাখা এবং তাদেরকে বেদীনী ও নৈতিকতা বিরোধী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করা। বাইবেলের গণনা পুস্তকে বারো জন 'সরদার'–এর কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কুরআনে এ 'নকীব' শব্দের মাধ্যমে তাদের যে পদমর্যাদা ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে বাইবেলের বর্ণনা থেকে তা প্রকাশ হয় না। বাইবেল তাদেরকে নিছক সরদার ও প্রধান হিসেবে পেশ করেছে। অন্যদিকে কুরআন তাদেরকে নৈতিক ও ধর্মীয় পর্যবেক্ষক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী বলে গণ্য করেছে।

৩২. অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে যে রসূলই আসবে যদি তোমরা তাঁর দাওয়াত কবুল করতে থাকো এবং তাকে সাহায্য করতে থাকো।

৩৩. অর্থাৎ আল্লাহর পথে নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করতে থাকো। যেহেতু মানুষ আল্লাহর পথে যা ব্যয় করে আল্লাহ তার এক একটি পাইকেও কয়েকগুণ বাড়িয়ে ফেরত দেবার ওয়াদা করেন, তাই কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহর পথে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে "ঋণ" হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে। তবে এখানে শর্ত হচ্ছে, তা অবশ্যি "উত্তম ঋণ" হতে হবে। অর্থাৎ বৈধ উপায়ে সংগৃহীত অর্থ আল্লাহর পথে ব্যয় করতে হবে, আল্লাহর বিধান অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে এবং আন্তরিকতা, সদিচ্ছা ও সৎ সংকল্প সহকারে ব্যয় করতে হবে।

৩৪. কারোর পাপ মোচন করার দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সত্য ও সঠিক পথ অবলম্বন করার এবং আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চিন্তা ও কর্মের সঠিক পথে চলার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ মানুষের আত্মা বিভিন্ন প্রকার পাপের মলিনতা থেকে এবং তার জীবনধারা বহু প্রকার দোষ ও ত্রুটি থেকে মুক্ত হয়ে যেতে থাকবে।

দুই, এ পরিশুদ্ধি সত্ত্বেও যদি কোন ব্যক্তি সামগ্রিকভাবে পূর্ণতার পর্যায়ে না পৌঁছুতে পারে এবং তার মধ্যে কিছু ত্রুটি ও গুনাহ থেকে যায় তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাকে জবাবদিহির সম্মুখীন করবেন না এবং সে গুনাহগুলো তার হিসেব থেকে বিলুপ্ত করে দেবেন। কারণ যে ব্যক্তি মৌলিক হেদায়াত ও সংশোধন গ্রহণ করে নিয়েছে আল্লাহ তার ছোটখাট ও পরোক্ষ ত্রুটিগুলো পাকড়াও করার মতো কঠোর নীতি অবলম্বন করবেন না।

৩৫. অর্থাৎ সে 'সাওয়া–উস–সাবীল' পেয়ে আবার তা হারিয়ে ফেলেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। 'সাওয়া–উস–সাবীলের' অনুবাদ করা যেতে পারে 'সরল–সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পথ।' কিন্তু এরপরও তার পুরোপুরি অর্থ প্রকাশিত হয় না। তাই আয়াতের অনুবাদের সময় হুবহু মূল শব্দটিই রাখা হয়েছে।

এ শব্দটির গভীর অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করার জন্য প্রথমেই একথাটি হৃদয়ংগম করে নিতে হবে যে, মানুষের অস্তিত্বের মধ্যেই নিহিত রয়েছে একটি ছোটখাটো জগত। এ খুদে জগতটি অসংখ্য শক্তি ও যোগ্যতায় পরিপূর্ণ। ইচ্ছা, আকাংখা, আবেগ, অনুভূতি ও বিভিন্ন ধরনের প্রবণতা এখানে বাসা বেঁধে আছে। দেহ ও প্রবৃত্তির বিভিন্ন দাবী এবং আত্মা ও মানবিক প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকার চাহিদার ভীড় এখানে সর্বক্ষণ। তারপর ব্যক্তি মানুষেরা একত্র হয়ে যে সমাজ কাঠামো নির্মাণ করে সেখানেও ঘটে অসংখ্য জটিল সম্পর্কের সমন্বয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের সাথে সাথে এ জটিলতাও বেড়ে যেতে থাকে। এরপর সারা দুনিয়ায় মানুষের চারদিকে জীবন ধারণের যেসব উপকরণ ছড়িয়ে আছে সেগুলো কাজে লাগাবার এবং মানবিক প্রয়োজনে ও মানব সভ্যতার বিনির্মাণে সেগুলো ব্যবহার করার প্রশ্নও ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক পর্যায়ে অসংখ্য ছোট বড় সমস্যার জন্ম দেয়।

মানুষ তার সহজাত দুর্বলতার কারণে জীবনের এ সমগ্র কর্মক্ষেত্রটির ওপর একই সময়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টি দিতে পারে না। তাই মানুষ নিজেই নিজের জীবনের জন্য এমন কোন পথ তৈরী করতে পারে না যেখানে তার সমস্ত শক্তির সাথে পুরোপুরি ইনসাফ করা যেতে পারে, যেখানে তার সমস্ত ইচ্ছা ও আশা-আকাংখা যথাযথভাবে পূর্ণ করা যায়, তার সমস্ত আবেগ, অনুভূতি ও প্রবণতার মধ্যে ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, একটি ন্যায়ানুগ সমতা রক্ষা করে তার ভেতরের ও বাইরের সমস্ত চাহিদা ও দাবী পূরণ করা যায়, তার সমাজ জীবনের সমস্ত সমস্যার প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করে তাদের সুষ্ঠু সমাধান বের করা যায় এবং জড় বস্তুগুলোকেও ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ন্যায়, ইনসাফ, সমতা, ভারসাম্য ও সত্যনিষ্ঠা সহকারে ব্যবহার করা যায়। মানুষ নিজেই যখন নিজের নেতা ও বিধাতায় পরিণত হয় তখন সত্যের বিভিন্ন দিকের মধ্য থেকে কোন একটি দিক, জীবনের প্রয়োজনের মধ্য থেকে কোন একটি প্রয়োজন, সমাধান প্রত্যাশী সমস্যাগুলোর কোন একটি সমস্যা তার মস্তিষ্ক ও চিন্তা জগতকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে যে, অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যাগুলোর সাথে সে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বে-ইনসাফী করতে থাকে। তখন তার এ সিদ্ধান্তকে জোরপূর্বক প্রতিষ্ঠিত করার ফলে জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় এবং সে ভারসাম্যহীনতার কোন এক প্রান্তের দিকে বাঁকাভাবে চলতে থাকে। তারপর এভাবে চলতে চলতে বক্রতার শেষ প্রান্তে পৌছার আগেই তা মানুষের জন্য অসহনীয় হয়ে ওঠে। ফলে যে সমস্ত দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার সাথে বেইনসাফী করা হয়েছিল তারা বিদ্রোহ শুরু করে দেয় এবং তাদের সাথে ইনসাফ করার জন্য তারা চাপ দিতে থাকে। কিন্তু এরপরও ইনসাফ হয় না। কারণ আবার সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। অর্থাৎ আগের ভারসাম্যহীনতার কারণে যেগুলোকে সবচেয়ে বেশী দাবিয়ে দেয়া হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে কোন একটি মানুষের মস্তিষ্ক ও চিন্তা জগতকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং একটি বিশেষ দাবী অনুযায়ী একটি বিশেষ দিকে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এখানে আবার অন্যান্য দিক, প্রয়োজন ও সমস্যার সাথে
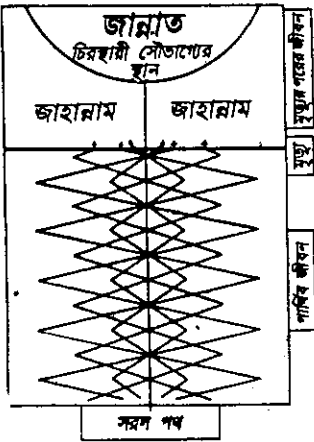
বেইনসাফী হতে থাকে। এভাবে সরল সোজা পথে চলা মানুষের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। সবসময়ই সে ঢেউয়ের দোলায় দোদুল্যমান থাকে এবং ধ্বংসের এক কিনার থেকে আর এক কিনারে তাকে ঠেলে দেয়া হয়। মানুষ নিজের জীবন ক্ষেত্রে চলার জন্য যতগুলো পথ তৈরী করেছে সবই বক্র রেখার মতো। একটি ভুল দিক থেকে যাত্রা শুরু করে আর একটি ভুল প্রান্তে গিয়ে তার চলা শেষ হয়। আবার সেখান থেকে যখন চলা শুরু করে তখন কোন ভুল দিকেই এগিয়ে চলে।

এ অসংখ্য বক্র ও ভুল পথের মধ্য দিয়ে এমন একটি পথ চলে গেছে যার অবস্থান ঠিক মধ্যভাগে। এ পথে মানুষের সমস্ত শক্তি সামর্থ, প্রবণতা, আশা–আকাংখা, আবেগ, অনুভূতি, তার দেহ ও আত্মার সমস্ত দাবী ও চাহিদা এবং তার জীবনের যাবতীয় সমস্যার সাথে পূর্ণ ইনসাফ করা হয়েছে। এ পথে কোন প্রকার বক্রতার লেশ মাত্র নেই। কোন দিকের প্রতি অযথা পক্ষপাতিত্ব ও তাকে সুযোগ–সুবিধা দান এবং কোন দিকের সাথে জুলুম ও বেইনসাফী করার প্রশ্নই এখানে নেই। মানুষের জীবনের সঠিক উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ এবং তার সাফল্য ও অগ্রগতির জন্য এ ধরনের একটি পথ একান্ত অপরিহার্য। মানুষের মূল প্রকৃতি এ পথেরই সন্ধানে ফিরছে। এ সোজা সরল রাজপথটির অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকার কারণেই তার বিভিন্ন বক্র পথের বিরুদ্ধে বারবার বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু নিজের চেষ্টায় এ রাজপথের সন্ধান লাভ করার ক্ষমতা মানুষের নেই। একমাত্র আল্লাহই তাকে এ পথের সন্ধান দিতে পারেন। মানুষকে এ পথের সন্ধান দেবার জন্যই আল্লাহ তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন।

কুরআন এ পথকেই 'সাওয়া–উস–সাবীল' ও 'সিরাতুল মুস্তাকীম' আখ্যা দিয়েছে। দুনিয়ার এ জীবন থেকে নিয়ে আখেরাতের জীবন পর্যন্ত অসংখ্য বক্র পথের মধ্য দিয়ে এ সরল সোজা রাজপথটি চলে গেছে। যে ব্যক্তি এ পথে অগ্রসর হয়েছে সে এ দুনিয়ায়ও সঠিক পথের যাত্রী এবং আখেরাতেও সফলকাম হয়েছে। আর যে ব্যক্তি এ পথ হারিয়ে ফেলেছে সে এখানে বিভ্রান্ত হয়েছে, ভুল পথে চলেছে এবং আখেরাতেও অনিবার্যভাবে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। কারণ, জীবনের সমস্ত বক্র পথ জাহান্নামের দিকেই চলে গেছে।

আধুনিক যুগের কতিপয় অজ্ঞ দার্শনিক মানুষকে উপর্যুপরি এক প্রান্তিকতা থেকে আর এক প্রান্তিকতার দিকে ধেয়ে চলতে দেখে এ ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া (Dialectic Process) মানব জীবনের উন্নতি, অগ্রগতি ও ক্রমবিকাশের স্বাভাবিক পথ। নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে তারা এ ধারণা করে বসেছেন যে, প্রথমে একটি চরমপন্থী দাবী (Thesis) মানুষকে একদিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারপর এর

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ۖ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ۙ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾

তারপর তাদের নিজেদের অংগীকার ভংগের কারণেই আমি তাদেরকে নিজের রহমত থেকে দূরে নিক্ষেপ করেছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি। এখন তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, তারা শব্দের হেরফের করে কথাকে একদিক থেকে আর একদিকে নিয়ে যায়, যে শিক্ষা তাদেরকে দেয়া হয়েছিল তার বড় অংশ তারা ভুলে গেছে এবং প্রায় প্রতিদিনই তাদের কোন না কোন বিশ্বাসঘাতকতার খবর তুমি লাভ করে থাকো, তাদের অতি অল্প সংখ্যক লোকই এ দোষমুক্ত আছে (কাজেই তারা যখন এ পর্যায়ে পৌছে গেছে তখন তাদের যে কোন কুকর্ম মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়)। তাই তাদেরকে মাফ করে দাও এবং তাদের কাজকর্মকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখো। আল্লাহ তাদেরকে পসন্দ করেন যারা সৎকর্মশীলতা ও পরোপকারের নীতি অবলম্বন করে।

এভাবে যারা বলেছিল আমরা "নাসারা"[৩৬] তাদের থেকেও আমি পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের স্মৃতিপটে যে শিক্ষা সংবদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল তারও বড় অংশ তারা ভুলে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও পারস্পরিক হিংসা–বিদ্বেষের বীজ বপন করে দিয়েছি। আর এমন এক সময় অবশ্যি আসবে যখন আল্লাহ তাদের জানিয়ে দেবেন তারা দুনিয়ায় কি করতো।

প্রতিক্রিয়ায় একই পর্যায়ের আরেকটি চরম ভাবাপন্ন দাবী (Antithesis) তাকে আর এক প্রান্তে ঠেলে নিয়ে যায়। আর এরপর তাদের উভয়ের মিশ্রণে (Synthesis) জীবনের অগ্রগতি ও বিকাশের পথ তৈরী হয়। তাদের মতে এটিই হচ্ছে মানব জীবনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের পথ। অথচ এটি মোটেই ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতির পথ নয়। বরং এ

হচ্ছে দুর্ভাগ্যের ধাক্কা, যা মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার এবং তার যথার্থ ক্রমবিকাশের পথে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করছে। প্রত্যেকটি চরমপন্থী ও প্রান্তিকতাবাদী দাবী জীবনকে কোন একটি লক্ষের দিকে চালিত করে এবং তাকে টেনে নিয়ে চলে। এভাবে চলতে চলতে যখন সে 'সাওয়া–উস–সাবীল' থেকে অনেক দূরে সরে যায় তখন জীবনেরই অপর কতকগুলো উপেক্ষিত সত্য, যাদের সাথে বেইনসাফী করা হচ্ছিল, তারাই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে থাকে। এ বিদ্রোহ একটি পাল্টা দাবীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে তাকে উল্টো দিকে টানতে থাকে। 'সাওয়া–উস্ সাবীল' যত কাছে আসতে থাকে ততই এ সংঘর্ষশীল দাবীগুলোর মধ্যে আপোস হতে থাকে এবং তাদের মিশ্রণে এমন কিছু জিনিস অস্তিত্বলাভ করে যা মানুষের জীবনের জন্য উপকারী ও লাভজনক। কিন্তু যখন সেখানে 'সাওয়া–উস–সাবীলের' সন্ধান দেয়ার মতো আলো থাকে না এবং তার ওপর অবিচল থাকার মতো ঈমানেরও অস্তিত্ব থাকে না তখন এ পাল্টা দাবী জীবনকে সেই স্থানে টিকে থাকতে দেয় না বরং নিজের শক্তির জোরে তাকে বিপরীত প্রান্তিকতার দিকে টেনে নিয়ে যেতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত জীবনের অন্য কিছু সত্যকে অস্বীকার করার পর্ব শুরু হয়ে যায়। এর ফলে আর একটা বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসব সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী দার্শনিকদের মধ্যে যদি কুরআনের আলো পৌঁছে গিয়ে থাকতো এবং তারা 'সাওয়া–উস–সাবীল' কি জিনিস তা দেখতে পেতেন। তাহলে তারা জানতে পারতেন, এ 'সাওয়া–উস–সাবীল'ই মানুষের জন্য একমাত্র সঠিক ও নির্ভুল পথ। বক্র রেখায় ক্রমাগত এক প্রান্তিকতা থেকে আর এক প্রান্তিকতায় ধাক্কা খেয়ে বেড়ানো মানব জীবনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের কোন সঠিক ও নির্ভুল পথ নয়।

৩৬. অনেকে মনে করেন নাসারা (نصارى) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে হযরত ঈসার জন্মভূমির নাম 'নাসেরা' (ناصره) থেকে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। আসলে নাসারা শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে 'নুসরাত' (نصرت) থেকে। ঈসা আলাইহিস সালামের উক্তি من انصارى الى الله (আল্লাহর পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?) এর জবাবে তাঁর হাওয়ারীগণ نحن انصار الله (আমরা হবো আল্লাহর কাজে সাহায্যকারী) বলে বক্তব্য পেশ করেছিলেন। সেখান থেকেই এর উৎপত্তি। খৃষ্টান লেখকরা নিছক বাহ্যিক সাদৃশ্য দেখে এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন যে, খৃষ্টবাদের ইতিহাসের প্রথম যুগে নাসেরীয়া(Nazarenes) নামে একটি সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল; তাদেরকে তাচ্ছিল্যের সাথে নাসেরী ও ইবূনী বলা হতো এবং কুরআন তাদের নামকেই সমগ্র খৃষ্টান সম্প্রদায়ের জন্য ব্যবহার করেছে। কিন্তু এখানে কুরআন দ্ব্যর্থহীন কন্ঠে ঘোষণা করছে যে, তারা নিজেরাই বলেছিল ঃ 'আমরা নাসারা'। আর একথাও সুস্পষ্ট যে, খৃষ্টানরা নিজেরা কখনো নিজেদেরকে নাসেরী বলে পরিচয় দেয়নি।

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম কখনো নিজের অনুসারীদেরকে 'ঈসায়ী' 'খৃষ্টান' বা 'মসীহী' নামে আখ্যায়িত করেননি। কারণ তিনি নিজের নামে কোন নতুন ধর্মের ভিত্তি স্থাপন করতে আসেননি। হযরত মূসা

আলাইহিস সালাম এবং তাঁর আগের ও পরের নবীগণ যে দীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন তারই পুনরুজ্জীবন ছিল তাঁর দাওয়াতের লক্ষ। তাই তিনি সাধারণ বনী ইসরাঈলদের এবং মূসার শরীয়াতের অনুসারীদের থেকে আলাদা কোন দল গঠন করেননি এবং তাদের কোন আলাদা নামও রাখেননি। তাঁর প্রাথমিক যুগের অনুসারীরা নিজেদেরকে ইসরাঈলী মিল্লাত থেকে আলাদা মনে করতেন না এবং নিজেরা কোন স্বতন্ত্র দল হিসেবেও সংগঠিত হননি। নিজেদের পরিচিতির জন্য তারা কোন বৈশিষ্টমূলক নাম ও চিহ্ন গ্রহণ করেননি। তারা ইহুদীদের সাথে বাইতুল মাকদিসের হাইকেলেই (ধর্মধাম) ইবাদাত করতে যেতেন এবং মূসার শরীয়াতের বিধিবিধান মেনে চলাকেই নিজেদের কর্তব্য মনে করতেন। (দেখুন বাইবেল, প্রেরিতদের কার্য বিবরণ পুস্তক ৩ ঃ ১–১০, ৫ ঃ ২১–২৫)।

পরবর্তী সময়ে উভয় পক্ষ থেকেই বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যক্রম শুরু হয়েছে। একদিকে হযরত ঈসার (আ) অনুসারীদের মধ্য থেকে সেন্টপল ঘোষণা করেন যে, শরীয়াতের বিধান অনুসরণের আর প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র ঈসার ওপর ঈমান আনাই নাজাতের তথা পরকালীন মুক্তির জন্য যথেষ্ট। আবার অন্যদিকে ইহুদী আলেমগণও হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে একটি পথভ্রষ্ট সম্প্রদায় বলে ঘোষণা করে তাদেরকে সাধারণ বনী ইসরাঈলদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেন। কিন্তু এ বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও শুরুতে এ নতুন সম্প্রদায়ের কোন পৃথক নাম ছিল না। হযরত ঈসার অনুসারীরা নিজেদেরকে কখনো 'শিষ্য' বলে উল্লেখ করতেন, কখনো 'ভ্রাতৃগণ' (ইখওয়ান), 'বিশ্বাসী' (মুমিন), 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে' (আল্লাযীনা আমানূ) আবার কখনো 'পবিত্রগণ' বলেও উল্লেখ করেছেন (প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তক, ২ঃ৪৪; ৪ঃ৩২; ৯ঃ২৬; ১১ঃ২৯; ১৩ঃ৫২; ১৫ঃ১ ও ২৩, রোমীয় ১৫ঃ২৫; কলসীয় ১ঃ১২)। অন্যদিকে ইহুদীরা এদেরকে কখনো 'গালীলী', কখনো 'নাসেরী' বা 'নাসরতী' আবার কখনো 'বেদাতী সম্প্রদায়' বলে অভিহিত করতো (প্রেরিতদের কার্য বিবরণ ২৪ঃ৫, লূক ১৩ঃ২)। নিছক নিন্দা ও বিদ্রূপচ্ছলে হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে এ নামে ডাকার কারণ ছিল এই যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মভূমি ছিল নাসেরা এবং তা ছিল ফিলিস্তিনের গালীল জেলার অন্তর্গত। কিন্তু তাদের এ বিদ্রূপাত্মক শব্দগুলো খুব বেশী প্রচলিত হতে পারেনি। ফলে এগুলো হযরত ঈসার অনুসারীদের নামে পরিণত হতে সক্ষম হয়নি।

এ দলের বর্তমান নাম "খৃষ্টান" (Christian) সর্বপ্রথম আন্তাকিয়াতে (انطاكيه) প্রদত্ত হয়। সেখানে ৪৩ বা ৪৪ খৃষ্টাব্দে কতিপয় মুশরিক অধিবাসী হযরত ঈসার অনুসারীদেরকে এ নামে অভিহিত করে। সে সময় সেন্টপল ও বার্নাবাস সেখানে পৌঁছে ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত হন। (প্রেরিতদের কার্য ১১ঃ২৬)। এ নামটিও মূলত বিরোধীদের পক্ষ থেকেই ঠাট্টা–বিদ্রূপচ্ছলেই রাখা হয়েছিল। ঈসার অনুসারীরা নিজেরাও এটাকে তাদের নাম হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তাদের শত্রুরা যখন তাদেরকে ঐ নামে ডাকতে শুরু করলো তখন তাদের নেতারা বললেন, যদি তোমাদেরকে খৃষ্টের সাথে যুক্ত করে খৃষ্টান বলে ডাকা হয়। তাহলে তাতে তোমাদের লজ্জা পাবার কি কারণ থাকতে পারে? (১–পিতর ৪ঃ১৬) এভাবে তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে শত্রুদের বিদ্রূপচ্ছলে দেয়া এ নামে নিজদেরকে আখ্যায়িত করতে থাকে। অবশেষে তাদের মধ্যে এ অনুভূতিই

يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَعْفُوا۟ عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَٰبٌ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَهُۥ سُبُلَ ٱلسَّلَٰمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِۦ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٦﴾

হে আহলি কিতাব! আমার রসূল তোমাদের কাছে এসে গেছে। সে আল্লাহর কিতাবের এমন অনেক কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করছে যেগুলো তোমরা গোপন করে রাখতে এবং অনেক ব্যাপার ক্ষমার চোখেও দেখছে।[৩৭] *তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে গেছে এক জ্যোতি এবং এমন একখানি সত্য দিশারী কিতাব, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর সন্তোষকামী লোকদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার পথপ্রদর্শন করেন*[৩৮] *এবং নিজ ইচ্ছাক্রমে তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোকের দিকে নিয়ে আসেন এবং সরল–সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করেন।*

খতম হয়ে যায় যে, এটি আসলে একটি খারাপ নাম এবং তাদেরকে শত্রুরা বিদ্রূপচ্ছলে এ নাম দিয়েছিল।

কুরআন এ কারণেই খৃস্টের অনুসারীদের ঈসায়ী, মসীহী বা খৃস্টান নামে আখ্যায়িত করেনি। বরং তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, তোমরা আসলে সেসব লোকদের অন্তর্গত যাদেরকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম 'মান আনসারী ইলাল্লাহ (কে আল্লাহর পথে আমাকে সাহায্য করবে?) বলে আহবান জানিয়েছিলেন এবং এর জবাবে সেই লোকেরা বলেছিল 'নাহ্নু আনসারুল্লাহ (আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী)।' তাই তোমরা নিজেদের প্রাথমিক ও মৌলিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে নাসারা বা আনসার। কিন্তু আজকের খৃষ্টীয় মিশনারীরা এ বিস্মৃত বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেবার কারণে কুরআনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পরিবর্তে উলটো অভিযোগ জানাচ্ছে যে, কুরআন তাদেরকে খৃস্টান না বলে নাসারা বলছে কেন?

৩৭. অর্থাৎ তোমাদের অনেক চুরি ও খেয়ানত ফাঁস করে দিচ্ছেন, আল্লাহর সত্য দীন কায়েম করার জন্য যেগুলো ফাঁস করে দেয়া অপরিহার্য। আর যেগুলো ফাঁস করে দেয়ার তেমন কোন যথার্থ প্রয়োজন নেই সেগুলো এড়িয়ে যাচ্ছেন।

৩৮. শান্তি ও নিরাপত্তা মানে ভুল দেখা, ভুল আন্দাজ–অনুমান করা ও ভুল কাজ করা থেকে দূরে থাকা এবং এর ফলাফল থেকেও নিজেকে সংরক্ষিত রাখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসূলের জীবন থেকে আলো সংগ্রহ করে, চিন্তা ও কর্মের

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑰

যারা বলে, "মারয়াম পুত্র মসীহই আল্লাহ" তারা অবশ্যি কুফরী করেছে।[৩৯] হে মুহাম্মাদ! ওদেরকে বলে দাও, আল্লাহ যদি মারয়াম পুত্র মসীহকে, তার মাকে ও সারা দুনিয়াবাসীকে ধ্বংস করতে চান, তাহলে তাঁকে তাঁর এ সংকল্প থেকে বিরত রাখার ক্ষমতা কার আছে? আল্লাহ তো আকাশসমূহের এবং এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবকিছুর মালিক। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন।[৪০] তাঁর শক্তি সবকিছুর ওপর পরিব্যাপ্ত।

প্রতিটি চৌমাথায় পৌছে সে কিভাবে এ ভুলগুলো থেকে সংরক্ষিত থেকেছে তা বুঝতে পারে।

৩৯. খৃস্টবাদীরা শুরুতেই ঈসা আলাইহিস সালামের ব্যক্তিত্বকে মানবিক সত্তা ও ইলাহী সত্তার মিশ্রণ গণ্য করে যে ভুল করেছিল তার ফলে হযরত ঈসার যথার্থ রূপ গোলক ধাঁধায় পরিণত হয়েছে। খৃস্টীয় আলেম সমাজ এ ধাঁধাঁর রহস্য উন্মোচনে যতই বাগাড়ম্বর ও কল্পনা–অনুমানের আশ্রয় নিয়েছেন। ততই জটিলতা বেড়ে গেছে। তাদের মধ্য থেকে যার চিন্তায় এ মিশ্র ব্যক্তিত্বের মানবিক সত্তার দিকটি বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে তিনি ঈসাকে আল্লাহর পুত্র এবং তিন জন স্বতন্ত্র খোদার একজন হবার ওপর জোর দিয়েছেন। আর যার চিন্তায় ইলাহী সত্তার দিকটি বেশী প্রভাব বিস্তার করেছে, তিনি ঈসাকে আল্লাহর দৈহিক প্রকাশ গণ্য করে তাঁকে পুরোপুরি আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন এবং তাঁকে আল্লাহ মনে করে তাঁর ইবাদাত করেছেন। আবার এ উভয় দলের মাঝামাঝি একটা পথ বের করতে যারা চেয়েছেন তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি এমন সব শাব্দিক ব্যাখ্যা সংগ্রহে নিয়োগ করেছেন যাতে হযরত ঈসাকে মানুষও বলা যায় আবার এ সংগে তাঁকে আল্লাহ মনে করাও যেতে পারে। আল্লাহ ও ঈসা পৃথক পৃথক থাকতে পারেন আবার একীভূতও হতে পারেন।(দেখুন, সূরা নিসা, ২১২, ২১৩ ও ২১৫ টীকা)।

৪০. এ বাক্যের মধ্যে এ মর্মে একটি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে যে, নিছক ঈসার অলৌকিক জন্ম, তাঁর নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং দৃষ্টি ও অনুভূতি গ্রাহ্য অলৌকিক কার্যকলাপে বিভ্রান্ত হয়ে যারা ঈসাকে 'আল্লাহ' মনে করছে তারা আসলে একান্তই অজ্ঞ। ঈসাতো আল্লাহর অসংখ্য অলৌকিক সৃষ্টির একটি নমুনা মাত্র। এটি দেখেই এসব দুর্বল দৃষ্টির অধিকারী লোকদের চোখ ঝল্সে গেছে। এদের দৃষ্টি যদি আর একটু প্রসারিত হতো

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصٰرٰى نَحْنُ اَبْنٰٓؤُا اللّٰهِ وَاَحِبَّآؤُهٗ ؕ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوْبِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ ؕ يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ؗ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ﴿۱۸﴾ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلٰى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِنْۢ بَشِيْرٍ وَّلَا نَذِيْرٍ ؗ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيْرٌ وَّنَذِيْرٌ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۱۹﴾

ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, "আমরা আল্লাহর সন্তান এবং তাঁর প্রিয়পাত্র।" তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তাহলে তোমাদের গোনাহের জন্য তিনি তোমাদের শাস্তি দেন কেন? আসলে তোমরাও ঠিক তেমনি মানুষ যেমন আল্লাহ অন্যান্য মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি যাকে চান মাফ করে দেন এবং যাকে চান শাস্তি দেন। পৃথিবী ও আকাশসমূহ এবং এ দুয়ের মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহর মালিকানাধীন এবং তাঁরই দিকে সবাইকে যেতে হবে।

হে আহ্‌লি কিতাব! আমার এ রসূল এমন এক সময় তোমাদের কাছে এসেছেন এবং তোমাদেরকে দীনের সুস্পষ্ট শিক্ষা দিচ্ছেন যখন দীর্ঘকাল থেকে রসূলদের আগমনের সিল্‌সিলা বন্ধ ছিল, তোমরা যেন একথা বলতে না পারো, "আমাদের কাছে তো সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী আসেনি।" বেশ, এই দেখো, এখন সেই সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী এসে গেছেন এবং আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।[৪১]

তাহলে এরা দেখতে পেতো, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির এর চাইতে আরো অনেক বেশী বিস্ময়কর নমুনা পেশ করে যাচ্ছেন এবং তাঁর শক্তি কোন একটি বিশেষ সীমানার মধ্যে আবদ্ধ নেই। কাজেই সৃষ্টির কোন বিস্ময়কর ক্ষমতা দেখে তাকে স্রষ্টা মনে করা বিরাট অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং সৃষ্টির কৃতিত্ব ও বিস্ময়কর কার্যাবলীর মধ্যে যে ব্যক্তি স্রষ্টার অসীম ক্ষমতার নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে এবং তা থেকে ঈমানের আলো সংগ্রহ করে সে-ই যথার্থ বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী।

৪১. এ বাক্যটি গভীর অর্থব্যঞ্জক ও উচ্চাংগের সাহিত্যিক অলংকারে সমৃদ্ধ। এখানে এর একটি অর্থ হচ্ছে, যে আল্লাহ ইতিপূর্বে সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারী

وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيْكُمْ
اَنْۢبِيَآءَ وَجَعَلَكُمْ مُّلُوْكًا ۖۗ وَّاٰتٰىكُمْ مَّا لَمْ يُؤْتِ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٠﴾
يٰقَوْمِ ادْخُلُوا الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِيْ كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوْا عَلٰٓى
اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوْا خٰسِرِيْنَ ﴿٢١﴾ قَالُوْا يٰمُوْسٰٓى اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبَّارِيْنَ ۖۗ
وَاِنَّا لَنْ نَّدْخُلَهَا حَتّٰى يَخْرُجُوْا مِنْهَا ۚ فَاِنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا فَاِنَّا
دٰخِلُوْنَ ﴿٢٢﴾

৪ রুকূ'

স্মরণ করো যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল, "হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আল্লাহর সেই নিয়ামতের কথা মনে করো, যা তিনি তোমাদের দান করেছিলেন। তিনি তোমাদের মধ্যে বহু নবীর জন্ম দিয়েছেন, তোমাদেরকে শাসকে পরিণত করেছেন এবং তোমাদেরকে এমন সব জিনিস দিয়েছেন, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেননি।[৪২] *হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! সেই পবিত্র ভূখণ্ডে প্রবেশ করো, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন।*[৪৩] *পিছনে হটো না। পিছনে হটলে তোমরা ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে।*[৪৪] *তারা জবাব দিল, "হে মূসা! সেখানে একটা অতীব দুর্ধর্ষ জাতি বাস করে। তারা সেখান থেকে বের হয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমরা কখনই সেখানে যাবো না। হাঁ, যদি তারা বের হয়ে যায় তাহলে আমরা সেখানে প্রবেশ করতে প্রস্তুত আছি।"*

পাঠাবার ক্ষমতা রাখতেন এখন তিনিই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সেই একই দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন এবং এ ধরনের নিযুক্তির ক্ষমতাও তাঁর ছিল। এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, যদি তোমরা এ সুসংবাদ দানকারী ও ভীতি প্রদর্শনকারীর কথা না মানো, তাহলে মনে রেখো, আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং সবকিছু করতে সক্ষম। তিনি তোমাদের যে শাস্তি দিতে চান তা কার্যকর করার ব্যাপারে তাঁকে কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয় না।

৪২. এখানে বনী ইসরাঈলের অতীত গৌরবের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বহু পূর্বে কোন এক সময়ে তারা এ গৌরবের অধিকারী ছিল। একদিকে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিলেন হযরত ইবরাহীম, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফের মতো মহান নবী ও রসূলগণ এবং অন্যদিকে তারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের আমলে ও তার পরবর্তী কালে মিসরে

قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ ۚ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴿٢٤﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۖ فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ۛ أَرْبَعِينَ سَنَةً ۛ يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٢٦﴾

ঐ ভীরু লোকদের মধ্যে দু'জন এমন লোকও ছিল[৪৫] যাদের প্রতি আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেছিলেন। তারা বললো, "এ শক্তিশালী লোকদের মোকাবিলা করে দরজার মধ্যে ঢুকে পড়ো। ভেতরে প্রবেশ করলে তোমরাই জয়ী হবে। আর যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো তাহলে আল্লাহর ওপর নির্ভর করো।" কিন্তু তারা আবার সেই একই কথা বললো ঃ "হে মূসা! যতক্ষণ তারা সেখানে অবস্থান করবে ততক্ষণ আমরা কোনক্রমেই সেখানে যাবো না। কাজেই তুমি ও তোমার রব, তোমরা দু'জনে সেখানে যাও এবং লড়াই করো, আমরা তো এখানে বসেই রইলাম।" একথায় মূসা বললো, "হে আমার রব! আমার ও আমার ভাই ছাড়া আর কারোর ওপর আমার কোন ইখতিয়ার নেই। কাজেই তুমি এ নাফরমান লোকদের থেকে আমাকে আলাদা করে দাও।" আল্লাহ জবাব দিলেন ঃ ঠিক আছে, তাহলে ঐ দেশটি চল্লিশ বছর পর্যন্ত তাদের জন্য হারাম। তারা পৃথিবীতে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াবে,[৪৬] এ নাফরমানদের প্রতি কখনো সহানুভূতি ও সমবেদনা প্রকাশ করো না।[৪৭]

ব্যাপক শাসন কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। দীর্ঘকাল পর্যন্ত তারাই ছিল তৎকালীন সভ্য জগতের সবচেয়ে প্রতাপশালী শাসক শক্তি এবং মিসর ও তার আশপাশের দেশে তাদেরই মুদ্রা প্রচলিত ছিল। সাধারণত ঐতিহাসিকগণ বনী ইসরাঈলের উত্থানের ইতিহাস শুরু করেন হযরত মূসার (আ) আমল থেকে। কিন্তু কুরআন এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করছে যে, বনী ইসরাঈলের উত্থানের আসল যুগটি ছিল হযরত মূসার পূর্বে এবং হযরত মূসা নিজেই তার জাতির সামনে তাদের এ গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস তুলে ধরেছিলেন।

৪৩. এখানে ফিলিস্তিনের কথা বলা হয়েছে। এ দেশটি হযরত-ইবরাহীম, হযরত ইসহাক ও হযরত ইয়াকুবের আবাসভূমি ছিল। বনী ইসরাঈল মিসর থেকে বের হয়ে এলে

আল্লাহ তাদের জন্য এ দেশটি নির্দিষ্ট করেন এবং সামনে অগ্রসর হয়ে এ দেশটি জয় করার নির্দেশ দেন।

৪৪. হযরত মূসা তাঁর জাতিকে নিয়ে মিসর থেকে বের হবার প্রায় দু'বছর পর যখন তাদের সাথে ফারানের মরু অঞ্চলে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান করছিলেন তখনই এ ভাষণটি দেন। এ মরু অঞ্চলটি আরবের উত্তরে ও ফিলিস্তিনের দক্ষিণ সীমান্ত সংশ্লিষ্ট সাইনা উপদ্বীপে অবস্থিত।

৪৫. 'ভীরু লোকদের মধ্য থেকে দু'জন বললো'–এ বাক্যাংশটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, যারা শক্তিশালীদেরকে ভয় করছিল তাদের মধ্য থেকে দু'জন বলে উঠলো। দুই, যারা আল্লাহকে ভয় করতো তদের মধ্য থেকে দু'জন বলে উঠলো।

৪৬. এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলের গণনা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরণ ও যিহোশূয় পুস্তকে পাওয়া যাবে। এর সংক্ষিপ্ত সার হচ্ছে ঃ হযরত মূসা ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য ফারান থেকে বনী ইসরাঈলের ১২ জন সরদারকে ফিলিস্তিন সফরে পাঠান। তারা ৪০ দিন সফর করার পর সেখান থেকে ফিরে আসেন। জাতির এক সাধারণ সমাবেশে তারা জানান যে, ফিলিস্তিন তো খাদ্য ও অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর প্রাচুর্যে ভরা এক সুখী সমৃদ্ধ দেশ, এতে সন্দেহ নেই। "কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা অত্যন্ত শক্তিশালী ...... তাদের ওপর আক্রমণ করার ক্ষমতা আমাদের নেই......... সেখানে আমরা যত লোক দেখেছি তারা সবাই বড়ই দীর্ঘদেহী। সেখানে আমরা বনী ইনাককেও দেখেছি। তারা মহাপরাক্রমশালী ও দুর্ধর্ষ। তারা বংশ পরম্পরায় পরাক্রমশালী। আর আমরা তো নিজেদের দৃষ্টিতেই ফড়িংয়ের মতো ছিলাম এবং তাদের দৃষ্টিতেও।"......এ বর্ণনা শুনে সবাই সমস্বরে বলে উঠে ঃ "হায়, যদি আমরা মিসরেই মরে যেতাম! হায়, যদি এ মরুর বুকেই আমরা মরে যেতাম! আল্লাহ কেন আমাদের ঐ দেশে নিয়ে গিয়ে তরবারির সাহায্যে হত্যা করাতে চায়? এরপর আমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা তো লুটের মালে পরিণত হবে। আমাদের জন্য মিসরে ফিরে যাওয়াই কি মংগলজনক হবে না?" তারপর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে এসো আমরা কাউকে নিজেদের সরদার বানিয়ে নিই এবং মিসরে ফিরে যাই। একথা শুনে ফিলিস্তিনে যাদেরকে পাঠানো হয়েছিল সেই বারোজন সরদারদের মধ্য থেকে দু'জন—ইউশা ও কালেব উঠে দাঁড়ান। তারা এ ভীরুতা ও কাপুরুষতার জন্য জাতিকে তিরস্কার করেন। কালেব বলেন, "চলো, আমরা অতর্কিতে আক্রমণ করে সে দেশটি দখল করে নিই। কারণ সে দেশটি পরিচালনা করার যোগ্যতা আমাদের আছে।" তারপর তারা দু'জন এক বাক্যে বলে ওঠেন, "যদি আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যি আমাদের সে দেশে পৌঁছাবেন।....... তবে তোমরা যেন আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না করো এবং সে দেশের লোকদের ভয়ে ভীত না হও।" "আমাদের সাথে আল্লাহ আছেন, কাজেই ওদের ভয় পেয়ো না।" কিন্তু জাতি তার জবাব দিল একথা বলে, "ওদেরকে পাথর মেরে হত্যা করো।" অবশেষে আল্লাহর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠলো এবং তিনি ফায়সালা করলেন, এখন ইউশা ও কালেব ছাড়া এ জাতির বয়স্ক পুরুষদের মধ্য থেকে আর কেউ সে ভূখণ্ডে প্রবেশ করতে পারবে না। এ জাতি চল্লিশ বছর পর্যন্ত গৃহহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে থাকবে। অবশেষে যখন এদের মধ্যকার বিশ বছরের থেকে শুরু করে তার ওপরের বয়সের সমস্ত লোক মরে যাবে এবং নবীন বংশধররা যৌবনে প্রবেশ

বনী ইসরাঈলের মরু পরিক্রমা
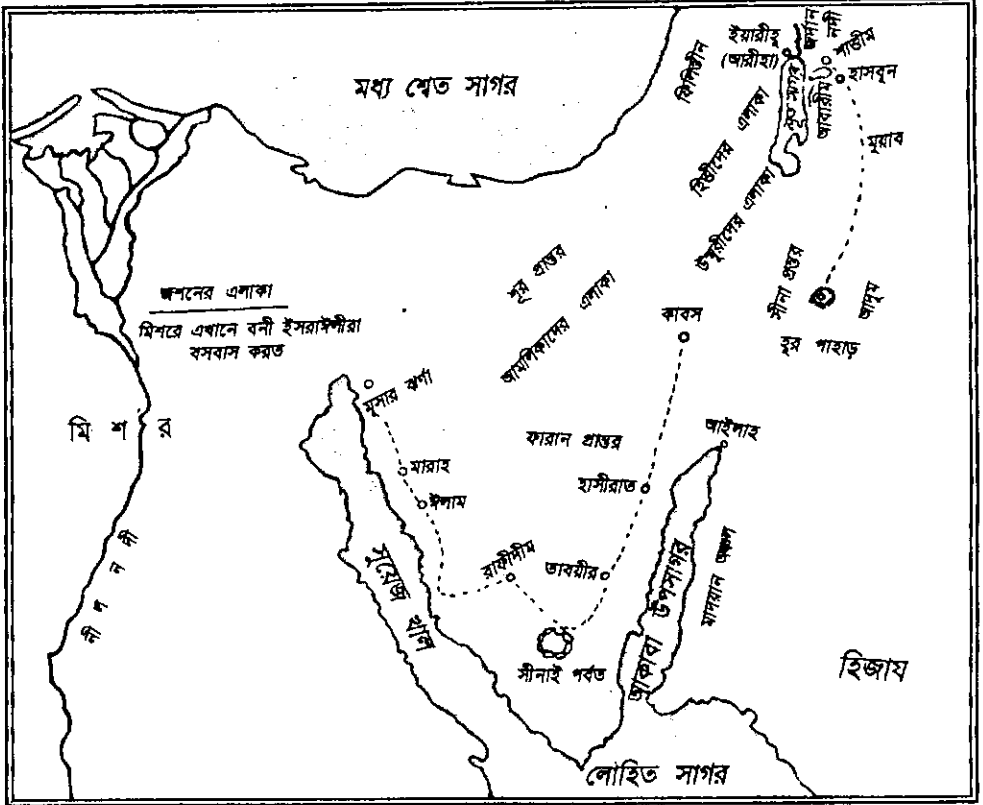
ব্যাখ্যা : হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের মিসর হতে বের করে সীনা প্রান্তরের মারাহ, ঈলাম ও রফীদাম–এর পথে সীন পর্বতের দিকে আসেন এবং এক বছরের কিছু বেশী কাল পর্যন্ত এ স্থানে অবস্থান করতে থাকেন। তাওরাতের বেশীর ভাগ বিধান এখানেই নাযিল হয়। অতপর তাকে বনী ইসরাঈলদের নিয়ে ফিলিস্তিনের দিকে যাওয়ার এবং উহা জয় করার নির্দেশ দেয়া হয়। বলা হয়, ইহা তোমাদেরকে মীরাস হিসেবে দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের সাথে নিয়ে তাব্‌য়ীর ও হাচীরাত–এর পথে 'ফারান' প্রান্তরে উপস্থিত হন। এখান হতে তিনি ফিলিস্তিনের অবস্থা জানার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। ফিদিল নামক জায়গায় এ প্রতিনিধিদল ফিরে এসে রিপোর্ট পেশ করে। হযরত ইউশা' ও কালিব ছাড়া প্রতিনিধি দলের অন্যান্যের রিপোর্ট ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। বনী ইসরাঈলরা তা শুনে চীৎকার করে উঠে এবং তারা ফিলিস্তিন অভিযানে যেতে অস্বীকার করে। তখন আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিলেন যে; এখন হতে চল্লিশ বছর কাল এরা এ অঞ্চলে ঘুরে ফিরবে এবং ইউশা' ও কালিব ছাড়া বর্তমান লোকদের আর কেহ ফিলিস্তিনের চেহারা দেখতে পাবে না। এর পর বনী ইসরাঈলরা ফারান প্রান্তর, শূর প্রান্তর, চীন প্রান্তর–এর মাঝে ইতস্তত দিশাহারা হয়ে ঘুরতে থাকে এবং আমালিকা, উমূরিয়া, আদুমীয়, মাদিয়ানী এবং মুয়াব–এর লোকদের সাথে লড়াই করতে থাকে। চল্লিশ বছর অতিবাহিত হবার উপক্রম হলে আদুম–এর সীমান্তের নিকট 'হূর' পর্বতে হযরত হারুন (আ) ইন্তেকাল করেন। পরে হযরত মূসা (আ) বনী ইসরাঈলদের নিয়ে মুয়াব অঞ্চলে প্রবেশ করেন ও এ পূর্ণ অঞ্চলটিকে দখল করে নিলেন। এভাবে হাসবুন ও শিত্তীম পর্যন্ত পৌছেন এবং আবারীম পর্বতে হযরত মূসা (আ) প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁর পর তাঁর প্রথম খলীফা ইউশা' পূর্বদিক হতে উর্দুন নদী পার হয়ে ইয়ারুহ (আরীহা) শহর জয় করেন। ইহা ছিল ফিলিস্তিনের প্রথম শহর, যা বনী ইসরাঈলদের দখলে আসে। এরপর অল্পকালের মধ্যেই সমগ্র ফিলিস্তিন তারা দখল করে।

এ মানচিত্রে উদ্ধৃত 'আয়লা' (প্রাচীন নাম ঈলাত আর বর্তমান নাম আকাবা) সেই ঐতিহাসিক স্থান, যেখানে সম্ভবত শনিবার ওয়ালাদের সূরা আল বাকারা (৮ রুকূ') ও সূরা আল আরাফ–এর (২১ রুকূ') উল্লেখিত সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল।

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَيْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا
وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ
مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۲۷﴾ لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ يَّدِيَ
اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّيْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾

৫ রুকূ'

আর তাদেরকে আদমের দু' ছেলের সঠিক কাহিনীও শুনিয়ে দাও। তারা দু'জন কুরবানী করলে তাদের একজনের কুরবানী কবুল করা হলো, অন্য জনেরটা কবুল করা হলো না। সে বললো, আমি তোমাকে মেরে ফেলবো। সে জবাব দিল, "আল্লাহ তো মুত্তাকীদের নজরানা কবুল করে থাকেন।[৪৮] তুমি আমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠালেও আমি তোমাকে মেরে ফেলার জন্য হাত উঠাবো না।[৪৯] আমি বিশ্ব জাহানের প্রভু আল্লাহকে ভয় করি।

করবে তখনি এদেরকে ফিলিস্তিন জয় করার সুযোগ দেয়া হবে। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বনী ইসরাঈলের ফারান মরুভূমি থেকে পূর্ব জর্দানে পৌছতে পৌছতে ৩৮ বছর লেগে যায়। যেসব লোক যুব বয়সে মিসর থেকে বের হয়েছিল তারা সবাই এ সময়ের মধ্যে মারা যায়। পূর্ব জর্দান জয় করার পর হযরত মূসারও ইন্তিকাল হয়। এরপর হযরত ইউশা ইবনে নূনের খিলাফত আমলে বনী ইসরাঈল ফিলিস্তিন জয় করতে সমর্থ হয়।

৪৭. বর্ণনার ধারাবাহিকতার প্রতি দৃষ্টি রেখে চিন্তা করলে এখানে এ ঘটনার বরাত দেবার উদ্দেশ্য পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। গল্পচ্ছলে একথা বর্ণনা করে বনী ইসরাঈলকে আসলে একথা বুঝানো হচ্ছে যে, মূসার সময় অবাধ্যতা, সত্য থেকে বিচ্যুতি ও কাপুরুষতার কাজ করে তোমরা যে শাস্তি পেয়েছিলে এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক নীতি অবলম্বন করলে তার চেয়ে অনেক বেশী শাস্তি ভোগ করবে।

৪৮. অর্থাৎ তোমার কুরবানী কবুল না হয়ে থাকলে এতে আমার কোন দোষ নেই। বরং তোমার কুরবানী কবুল না হওয়ার কারণ হচ্ছে এই যে, তোমার মধ্যে আল্লাহভীতি বা তাকওয়া নেই। কাজেই আমাকে হত্যা না করে বরং তোমার নিজের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টির চিন্তা করা উচিত।

৪৯. এর অর্থ এ নয় যে, তুমি আমাকে হত্যা করতে এলে আমি হাত বেঁধে তোমার সামনে নিহত হবার জন্য তৈরী হয়ে যাবো এবং নিজের প্রতিরক্ষা করবো না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও করো কিন্তু আমি তোমাকে হত্যা করতে চাইবো না। তুমি আমাকে হত্যা করার জন্য কলা-কৌশল অবলম্বন ও ফন্দি ফিকির করতে

إِنِّىٓ أُرِيدُ أَن تَبُوٓأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحٰبِ النَّارِ ۚ
وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِينَ ﴿٢٩﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُۥ نَفْسُهُۥ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُۥ
فَأَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِينَ ﴿٣٠﴾ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ
كَيْفَ يُوٰرِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ۚ قَالَ يٰوَيْلَتٰىٓ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ
مِثْلَ هٰذَا الْغُرَابِ فَأُوٰرِىَ سَوْءَةَ أَخِى ۖ فَأَصْبَحَ مِنَ النّٰدِمِينَ ﴿٣١﴾

আমি চাই, আমার ও তোমার পাপের ভার তুমি একাই বহন করো।[৫০] এবং তুমি জাহান্নামী হয়ে যাও। জালেমদের জুলুমের এটিই সঠিক প্রতিফল।" অবশেষে তার প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনা তার ভাইকে মেরে ফেলা তার জন্য সহজ করে দিল এবং তাকে মেরে ফেলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তরভুক্ত হয়ে গেলো। তারপর আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন। সে মাটি খুঁড়তে লাগলো, যাতে তাকে দেখিয়ে দেয় তার ভাইয়ের লাশ কিভাবে লুকিয়ে ফেলবে। এ দৃশ্য দেখে সে বললো, হায় আফসোস! আমি এ কাকটির মতোও হতে পারলাম না যাতে নিজের ভাইয়ের লাশটিও লুকাতে পারি।[৫১] এরপর নিজের কৃতকর্মের জন্য সে খুবই অনুতপ্ত হলো।[৫২]

চাও, তা করতে পারো, এ ব্যাপারে তোমার পূর্ণ ইখতিয়ার আছে। কিন্তু তুমি আমাকে হত্যা করার প্রস্তুতি চালাচ্ছো, একথা জানার পরও আমি তার আগেই তোমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করবো না। এখানে এতটুকু কথা অবশ্যি মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তির নিজেকে অবলীলায় হত্যাকারীর সামনে পেশ করে দেয়া এবং জালেমের আক্রমণ প্রতিহত না করা কোন সওয়াবের কাজ নয়। তবে যদি আমি জেনে থাকি, কোন ব্যক্তি আমাকে হত্যা করার ফিকিরে লেগে আছে এবং এ জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে আর এরপরও আমি তাকে হত্যা করার চিন্তা না করি এবং প্রথম অন্যায় আক্রমণ আমার পক্ষ থেকে না হয়ে বরং তার পক্ষ থেকে হোক, এটাকে অগ্রাধিকার দিই, তাহলে এতে অবশ্যি সওয়াব আছে। এটিই ছিল আদম আলাইহিস সালামের সৎছেলেটির বক্তব্যের অর্থ ও মূল কথা।

৫০. অর্থাৎ আমাদের পরস্পরকে হত্যা করার প্রচেষ্টায় আমাদের দু'জনের গুনাহগার হবার পরিবর্তে আমি বরং ভাল মনে করছি আমাদের উভয়ের গুনাহ তোমার একার ভাগে পড়ুক। তোমার নিজের পক্ষ থেকে হত্যার উদ্যোগের গুনাহ এবং তোমার আক্রমণ থেকে আমার আত্মরক্ষার চেষ্টার কারণে তোমার যা ক্ষতি হয় তার গুণাহও।

৫১. এভাবে মহান আল্লাহ একটি কাকের মাধ্যমে আদমের বিভ্রান্ত ও অসৎ পুত্রটিকে তার মূর্খতা ও অজ্ঞতা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। আর একবার যখন সে নিজের মনের

مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ ۚ كَتَبْنَا عَلٰى بَنِىٓ إِسْرَآءِيلَ أَنَّهُۥ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

এ কারণেই বনী ইসরাঈলের জন্য আমি এ ফরমান লিখে দিয়েছিলাম,[৫৩] "নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করা ছাড়া অন্য কোন কারণে যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি কারো জীবন রক্ষা করলো সে যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জীবন রক্ষা করলো।"[৫৪] কিন্তু তাদের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমার রসূলগণ একের পর এক সুস্পষ্ট হেদায়াত নিয়ে তাদের কাছে এলো, তারপরও তাদের বিপুল সংখ্যক লোক পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই থেকে গেলো।

প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করার সুযোগ পেয়েছে তখন তার লজ্জা কেবলমাত্র এতটুকু বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি যে, সে লাশ লুকাবার কৌশল বের করার ব্যাপারে কাকের থেকে পেছনে থেকে গেলো কেন বরং তার মনে এ অনুভূতিও জন্ম নিয়েছে যে, নিজের ভাইকে হত্যা করে সে কত বড়ই না মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে। পরবর্তী বাক্য "সে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হলো"—থেকে এ অর্থই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫২. ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর কতিপয় মর্যাদাশালী সাহাবায়ে কেরামকে হত্যা করার জন্য যে চক্রান্ত করেছিল তার ব্যাপারে তাদেরকে সূক্ষ্মভাবে তিরস্কার করাই হচ্ছে এখানে এ ঘটনাটি উল্লেখ করার উদ্দেশ্য। (এ জন্য এ সূরার ৩০ টীকাটি দেখে নিন) দু'টি ঘটনার মধ্যে সাদৃশ্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। মহান আল্লাহ আরবের এ নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে আরব ও বিশ্ববাসীর নেতৃত্ব দানের জন্য কবুল করে নিয়েছিলেন এবং এ পুরাতন আহ্‌লি কিতাবদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—এর ভিত্তি ছিল একমাত্র এই যে, একদিকে তাকওয়া ছিল এবং অন্যদিকে তাকওয়া ছিল না। কিন্তু যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল তারা নিজেদের প্রত্যাখ্যাত হবার কারণ সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করা এবং যেসব দোষ ও অপরাধের কারণে তারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল সেগুলো সংশোধন ও দূর করতে উদ্বুদ্ধ হবার পরিবর্তে আদমের বিভ্রান্ত পুত্রটি যেমন মূর্খতার গর্তে নিমজ্জিত হয়েছিল, ঠিক তেমনি তারাও এমনসব লোককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল যাদেরকে আল্লাহ কবুল করে নিয়েছিলেন। অথচ একথা সুস্পষ্ট ছিল, এ ধরনের মূর্খতাপ্রসূত কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা কখনো আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় হতে

إِنَّمَا جَزَٰٓؤُا۟ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِى ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ عَلَيْهِمْ ۖ فَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٤﴾

যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে লড়াই করে এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়,[৫৫] তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলিবিদ্ধ করা হবে বা তাদের হাত পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলা হবে। অথবা তাদেরকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হবে।[৫৬] দুনিয়ায় তাদের জন্য এ অপমান ও লাঞ্ছনা নির্ধারিত রয়েছে আর আখেরাতে রয়েছে তাদের জন্য এর চাইতেও বড় শাস্তি। তবে যারা তোমাদের হাতে ধরা পড়ার আগেই তাওবা করে তাদের জন্য নয়। তোমাদের জেনে রাখা উচিত, আল্লাহ ক্ষমাশীল ও অনুগ্রহকারী।[৫৭]

পারতো না। বরং এসব কার্যকলাপ তাদেরকে আল্লাহর নিকট আরো বেশী অপ্রিয় করে তুলেছিল এবং তারা আরো বেশী প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

৫৩. অর্থাৎ যেহেতু আদমের এ জালেম সন্তানটি যেসব অসৎগুণের প্রকাশ ঘটিয়েছিল বনী ইসরাঈলের মধ্যেও সেইসব গুণের নিদর্শন পাওয়া যেতো, তাই মহান আল্লাহ তাদেরকে নরহত্যা থেকে বিরত থাকার ওপর ভীষণভাবে জোর দিয়েছিলেন এবং তাঁর ফরমানে একথা লিখে দিয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, বর্তমান প্রচলিত বাইবেলে আল্লাহর ফরমানের এ মূল্যবান শব্দাবলীর ঠাঁই নেই। তবে তালমূদে এ বিষয়বস্তুটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি ইসরাঈলের একটি প্রাণকে হত্যা করলো আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে হত্যা করলো। আর যে ব্যক্তি ইসরাঈলের একটি প্রাণ রক্ষা করলো আল্লাহর কিতাবের দৃষ্টিতে সে যেন সারা দুনিয়ার মানুষকে রক্ষা করলো।" এভাবে তালমূদে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, হত্যা মামলায় বনী ইসরাঈলের বিচারপতিরা সাক্ষীদেরকে সম্বোধন করে বলতেন ঃ "যে ব্যক্তি একজন মানুষকে হত্যা করে সে এমনভাবে জবাবদিহি করার যোগ্য যেন সে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে হত্যা করেছে।"

৫৪. এর অর্থ হচ্ছে, দুনিয়ার প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে অন্য মানুষের প্রাণের প্রতি মর্যাদাবোধ যদি জাগ্রত থাকে এবং তাদের প্রত্যেকে অন্যের জীবনের স্থায়িত্বে ও সংরক্ষণে সাহায্যকারী হবার মনোভাব পোষণ করে তা হলেই কেবল মানব জাতির অস্তিত্ব নিশ্চিত

ও নিরাপদ হতে পারে। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে কেবলমাত্র ঐ এক ব্যক্তির ওপর জুলুম করে না বরং সে একথাও প্রমাণ করে যে, তার অন্তরে মানুষের জীবনের প্রতি মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতির কোন স্থান নেই। কাজেই সে সমগ্র মানবতার শত্রু। কারণ তার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্টের অস্তিত্ব বিরাজমান যা প্রতিটি মানুষের মধ্যে পাওয়া গেলে সারা দুনিয়া থেকে মানব জাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষায় সাহায্য করে সে আসলে মানবতার সাহায্যকারী ও সমর্থক। কারণ তার মধ্যে এমন গুণ পাওয়া যায়, যার ওপর মানবতার অস্তিত্ব নির্ভরশীল।

৫৫. পৃথিবী বলতে এখানে পৃথিবীর সেই অংশ ও অঞ্চল বুঝাচ্ছে যেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার দায়িত্ব ইসলামী সরকার গ্রহণ করেছে। আর আল্লাহ ও রসূলের সাথে লড়াই করার অর্থ হচ্ছে, ইসলামী সরকার দেশে যে সৎ ও সত্যনিষ্ঠ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন করেছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। পৃথিবীতে একটি সৎ ও সত্যনিষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই আল্লাহর ইচ্ছা এবং এ জন্য তিনি নিজের রসূল পাঠিয়েছিলেন। সেই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে পৃথিবীতে অবস্থানকারী মানুষ, পশু, বৃক্ষ ইত্যাদি সমস্ত সৃষ্টি শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে, মানবতা তার প্রকৃতির কাংখিত পূর্ণতায় পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং পৃথিবীর সমুদয় উপায় উপকরণ এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যার ফলে সেগুলো মানবতার ধ্বংস ও বিলুপ্তির নয় বরং তার উন্নতির সহায়ক হবে। এ ধরনের ব্যবস্থা কোন ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাকে নষ্ট করার প্রচেষ্টা চালানো, তা ক্ষুদ্র পরিসরে হত্যা, লুন্ঠন, রাহাজানি, ডাকাতি ইত্যাদির পর্যায়ে চালানো হোক অথবা আরো বড় আকারে, এ সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে উৎখাত করে তার জায়গায় কোন বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেই চালানো হোক না কেন, তা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেই বিবেচিত হবে। এটা ঠিক তেমনি যেমন ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কোন ব্যক্তির ভারতে বৃটিশ সরকারের ক্ষমতা উচ্ছেদের প্রচেষ্টাকে "সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ" (Waging war against the king) করার অপরাধে অভিযুক্ত গণ্য করা হয়েছে—সে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোন একজন মামুলি সিপাইয়ের বিরুদ্ধে কিছু করলেও এবং সম্রাট তার নাগালের বহু দূরে অবস্থান করলেও তার অপরাধের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না।

৫৬. এ বিভিন্ন ধরনের শাস্তির কথা এখানে সংক্ষেপে বলে দেয়া হয়েছে, যাতে করে কাযী বা সমকালীন ইসলামী শাসক নিজের ইজতিহাদের মাধ্যমে প্রত্যেক অপরাধীকে তার অপরাধের ধরন ও মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দিতে পারেন। আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা প্রকাশ করা যে, ইসলামী হুকুমাতের আওতায় বাস করে কোন ব্যক্তির ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা চালানো নিকৃষ্ট ধরনের অপরাধ এবং এ জন্য তাকে উল্লেখিত চরম শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন শাস্তি দেয়া যেতে পারে।

৫৭. অর্থাৎ যদি তারা বিপর্যয় সৃষ্টির প্রচেষ্টা থেকে বিরত হয়, সৎ ও সত্যনিষ্ঠ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন ও তাকে ছিন্নভিন্ন করার অপচেষ্টা পরিহার করে এবং তাদের পরবর্তী কর্মনীতি একথা প্রমাণ করে যে, তারা শান্তিপ্রিয়, আইনের অনুগত ও সদাচারী হয়ে গেছে আর তারপরই যদি তাদের আগের অপরাধের কথা জানা যায়, তাহলে ওপরে বর্ণিত শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে কোন শাস্তি তাদেরকে দেয়া হবে না। তবে যদি তারা মানুষের

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿৩৫﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۚ وَلَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿৩৬﴾ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ
مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿৩৭﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا
جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿৩৮﴾

৬ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর দরবারে নৈকট্যলাভের উপায় অনুসন্ধান করো[৫৮] এবং তাঁর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করো,[৫৯] সম্ভবত তোমরা সফলকাম হতে পারবে। ভালভাবে জেনে নাও, যারা কুফরীর নীতি অবলম্বন করেছে সারা দুনিয়ার ধন-দৌলত যদি তাদের অধিকারে থাকে এবং এর সাথে আরো সমপরিমাণও যুক্ত হয়। আর তারা যদি কিয়ামতের দিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য সেগুলো মুক্তিপণ হিসেবে দিতে চায়, তাহলেও তাদের কাছ থেকে তা গৃহীত হবে না। তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করবেই। তারা জাহান্নামের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে। কিন্তু তা তারা পারবে না। তাদেরকে স্থায়ী শাস্তি দেয়া হবে।

চোর—পুরুষ বা নারী যেই হোক না কেন, উভয়ের হাত কেটে দাও।[৬০] এটা তাদের কর্মফল এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আল্লাহর শক্তি সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি জ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ।

অধিকারের ওপর কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে থাকে, তাহলে তার দায়িত্ব থেকে তাদেরকে মুক্ত করা যাবে না। যেমন তারা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল অথবা কারোর সম্পদ অন্যায়ভাবে হস্তগত করেছিল বা অন্য কোন অপরাধ করেছিল, এ অবস্থায় তাদের বিরুদ্ধে ঐ বিশেষ অপরাধ সংক্রান্ত ফৌজদারী মামলা চালানো হবে। কিন্তু বিদ্রোহ, বিশ্বাসঘাতকতা বা আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কিত কোন মামলা তাদের বিরুদ্ধে চালানো হবে না।

৫৮. অর্থাৎ এমন প্রত্যেকটি উপায় অনুসন্ধান করতে থাকো যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে পৌছতে পারো।

৫৯. মূলে (جَاهِدُوا) "জাহিদু" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে নিছক 'প্রচেষ্টা ও সাধনা' শব্দ দু'টির মাধ্যমে এর অর্থের সবটুকু প্রকাশ হয় না। আর (مُجَاهَدَه) 'মুজাহাদা' শব্দটির মধ্যে মুকাবিলার অর্থ পাওয়া যায়। এর সঠিক অর্থ হচ্ছে ঃ যেসব শক্তি আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে, যারা তোমাদের আল্লাহর মর্জি অনুসারে চলতে বাধা দেয় এবং তাঁর পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে, যারা তোমাদের পুরোপুরি আল্লাহর বান্দা হিসেবে জীবন যাপন করতে দেয় না এবং নিজের বা আল্লাহর ছাড়া আর কারোর বান্দা হবার জন্য তোমাদের বাধ্য করে, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের সম্ভাব্য সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাও। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রামের ওপর তোমাদের সাফল্য এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ নির্ভর করছে।

এভাবে এ আয়াতটি মুমিন বান্দাকে প্রতিটি ক্ষেত্রে চতুর্মুখী ও সর্বাত্মক লড়াই করার নির্দেশ দেয়। একদিকে আছে অভিশপ্ত ইবলীস এবং তার শয়তানী সেনাদল। অন্যদিকে আছে মানুষের নিজের নফ্স ও তার বিদ্রোহী প্রবৃত্তি। তৃতীয় দিকে আছে এমন এক আল্লাহ বিমুখ মানব গোষ্ঠী যাদের সাথে মানুষ সব ধরনের সামাজিক, তামাদ্দুনিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক সূত্রে বাঁধা। চতুর্থ দিকে আছে এমন ভ্রান্ত ধর্মীয় তামাদ্দুনিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যার ভিত্তিভূমি গড়ে উঠেছে আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ওপর এবং তা সত্যের আনুগত্য করার পরিবর্তে মিথ্যার আনুগত্য করতে মানুষকে বাধ্য করে। এদের সবার কৌশল বিভিন্ন কিন্তু সবার চেষ্টা একমুখী। এরা সবাই মানুষকে আল্লাহর পরিবর্তে নিজের অনুগত করতে চায়। বিপরীত পক্ষে, মানুষের পুরোপুরি আল্লাহর অনুগত হওয়া এবং ভিতর থেকে বাইর পর্যন্ত একমাত্র আল্লাহর নির্ভেজাল বান্দায় পরিণত হয়ে যাওয়ার ওপরই তার উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের মর্যাদায় উন্নীত হওয়া নির্ভর করে। কাজেই এ সমস্ত প্রতিবন্ধক ও সংঘর্ষশীল শক্তির বিরুদ্ধে একই সাথে সংগ্রামমুখর হয়ে, সবসময় ও সব অবস্থায় তাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত থেকে এবং এ সমস্ত প্রতিবন্ধককে বিধ্বস্ত ও পর্যুদস্ত করে আল্লাহর পথে অগ্রসর না হলে নিজের অভীষ্ট লক্ষেপৌছানো তার পক্ষে কোনক্রমেই সম্ভব নয়।

৬০. দু'হাত নয় বরং এক হাত। আর সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারেও একমত যে, প্রথমবার চুরি করলে ডান হাত কাটতে হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لا قطع على خائن "খেয়ানতকারীর হাত কাটা হবে না," এ থেকে জানা যায়, খেয়ানত বা আত্মসাৎ ইত্যাদি চুরির পর্যায়ভুক্ত নয়। বরং চুরি বলতে এমন কাজ বুঝায় যার মাধ্যমে মানুষ একজনের ধন সম্পদ তার নিয়ন্ত্রণ ও সংরক্ষণ থেকে বের করে নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সাথে এরূপ নির্দেশও দিয়েছেন যে, একটি ঢালের মূল্যের চেয়ে কম পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা যাবে না। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে একটি ঢালের মূল্য ছিল দশ দিরহাম, ইবনে উমরের বর্ণনা অনুযায়ী তার মূল্য ছিল তিন দিরহাম, আনাস ইবনে মালিকের বর্ণনা অনুযায়ী পাঁচ দিরহাম এবং হযরত আয়েশার বর্ণনা অনুযায়ী ছিল অর্ধ দিনার। সাহাবীদের এ মতবিরোধের কারণে চুরির সর্বনিম্ন নিসাব অর্থাৎ কমপক্ষে কি পরিমাণ চুরি করলে হাত কাটা হবে এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۖ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

তবে যে ব্যক্তি জুলুম করার পর তাওবা করবে এবং নিজের সংশোধন করে নেবে, আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি আবার তার দিকে ফিরে আসবে।[৬১] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। তুমি কি জানো না, আল্লাহ পৃথিবী ও আকাশ রাজ্যের মালিক? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন এবং যাকে চান ক্ষমা করে দেন, তিনি সব জিনিসের ওপর ইখতিয়ার রাখেন।

দিয়েছে। ইমাম আবু হানীফার মতে এর সর্বনিম্ন পরিমাণ দশ দিরহাম। ইমাম মালেক, ইমাম শাফেঈ ও ইমাম আহমদের মতে এক–চতুর্থাংশ দীনার। (সে যুগের দিরহামে থাকতো ৩ মাসা ১ $\frac{১}{৫}$ রতি পরিমাণ রূপা এবং এক–চতুর্থাংশ দীনার হতো ৩ দিরহামের সমান।)

আবার এমন অনেক জিনিস আছে যেগুলো চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া যাবে না। যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ لا قطع فى ثمرة ولا كثر (অর্থাৎ ফল ও সবজী চুরি করলে হাত কাটা যাবে না) لا قطع فى طعام (অর্থাৎ খাদ্যবস্তু চুরি করলে হাত কাটা যাবে না)। হযরত আয়েশা (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে বলা হয়েছে ঃ

لم يكن قطع السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الشئ التافه –

"তুচ্ছ ও নগণ্য বস্তু চুরির অপরাধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলে হাত কাটা হতো না।"

হযরত আলী ও হযরত উসমানের ফায়সালা ছিল لا قطع فى الطير (অর্থাৎ পাখি চুরি করলে হাত কাটা যাবে না) এবং সাহাবীগণের মধ্য থেকে কেউ এ ব্যাপারে মতবিরোধ প্রকাশ করেননি। তাছাড়া হযরত উমর ও আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বাইতুলমাল থেকে কেউ কোন বস্তু চুরি করলে তার হাত কাটেননি। এ ব্যাপারেও কোথাও সাহাবায়ে কেরামের কোন মতবিরোধের উল্লেখ নেই। এসব মৌল উৎসের ভিত্তিতে ফিকাহর বিভিন্ন ইমাম কিছু নির্দিষ্ট বস্তু চুরি করার অপরাধে হাত কাটার দণ্ড না দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। ইমাম আবু হানীফার মতে শাক–সবজি, ফল, গোশত রান্না করা খাবার, যে শস্য এখনো স্তূপীকৃত করা হয়নি এবং খেলার সরঞ্জাম ও বাদ্যযন্ত্র চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হবে না। এ ছাড়াও তিনি বনে বিচরণকারী পশু ও বাইতুল–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ مِنَ ٱلَّذِينَ
قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِأَفْوَٰهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ۛ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا۟ ۛ سَمَّٰعُونَ
لِلْكَذِبِ سَمَّٰعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ۖ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنۢ بَعْدِ
مَوَاضِعِهِۦ ۖ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَٰذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحْذَرُوا۟ ۚ
وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتَهُۥ فَلَن تَمْلِكَ لَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ
لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ۚ لَهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا خِزْىٌ ۖ وَلَهُمْ فِى
ٱلْـَٔاخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٤١﴾

হে রসূল! কুফরীর পথে যারা দ্রুত পদচারণার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে তারা যেন তোমার মর্মপীড়ার কারণ না হয়,[৬২] যদিও তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা মুখে বলে আমরা ঈমান এনেছি কিন্তু তাদের অন্তর ঈমান আনেনি অথবা তারা এমন সব লোকের অন্তরভুক্ত হয় যারা ইহুদী হয়ে গেছে, যাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, তারা মিথ্যা ভাষণ শোনার জন্য কান পেতে বসে থাকে[৬৩] এবং যারা কখনো তোমার কাছে আসেনি তাদের জন্য আড়ি পেতে থাকে,[৬৪] আল্লাহর কিতাবের শব্দাবলীর সঠিক স্থান নির্ধারিত হওয়া সত্ত্বেও যারা সেগুলোকে তাদের আসল অর্থ থেকে বিকৃত করে[৬৫] এবং লোকদের বলে, যদি তোমাদের এ হুকুম দেয়া হয় তাহলে মেনে নাও অন্যথায় মেনো না।[৬৬] যাকে আল্লাহ নিজেই ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচাবার জন্য তোমরা কিছুই করতে পারো না।[৬৭] এসব লোকের অন্তরকে আল্লাহ পবিত্র করতে চাননি।[৬৮] এদের জন্য দুনিয়াতে আছে লাঞ্ছনা এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি।

মালের জিনিস চুরি করলে তাতে হাত কাটার শাস্তি নেই বলে ঘোষণা করেছেন। অনুরূপভাবে অন্যান্য ইমামগণও কোন কোন জিনিস চুরির ক্ষেত্রে এ শাস্তি কার্যকর নয় বলে ঘোষণা দিয়েছেন। কিন্তু এর অর্থ এ নয় যে, এ চুরিগুলোর অপরাধে আদতে কোন শাস্তিই দেয়া হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, এ অপরাধগুলোর কারণে হাত কাটা হবে না।

৬১. এর অর্থ এ নয় যে, তার হাত কাটা হবে না। বরং এর অর্থ হচ্ছে, হাত কাটার পর যে ব্যক্তি তাওবা করবে এবং নিজেকে চুরি থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত রেখে আল্লাহর

সৎ বান্দায় পরিণত হয়ে যাবে সে আল্লাহর গযব থেকে রক্ষা পাবে। এ অবস্থায় তার গায়ে যে গুনাহের কলংক লেগেছিল আল্লাহ তা ধুয়ে দেবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তি হাত কেটে যাবার পরও যদি নিজেকে অসৎ সংকল্প মুক্ত না করে এবং আগের দুষ্কৃতির মনোভাব লালন করতে থাকে, যার ভিত্তিতে সে চুরি করেছিল এবং তাকে হাত কাটার শাস্তি দেয়া হয়েছিল, তাহলে এর অর্থ এ দাঁড়ায় যে, হাত তার দেহ থেকে আলাদা হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু তার অন্তরে চুরির মনোভাব এখনো অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাই হাত কাটার আগে সে যেমন আল্লাহর গযবের অধিকারী ছিল হাত কাটার পরেও ঠিক তেমনিই থেকে যাবে। তাই কুরআন মজীদ চোরকে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার এবং নিজের সংশোধন করার নির্দেশ দেয়। কারণ হাত কাটা হয়েছে সামাজিক ও তামাদ্দুনিক ব্যবস্থাপনাকে বিশৃংখলামুক্ত করার জন্য। এ শাস্তির কারণে আত্মা ও মন পবিত্র ও কলুষতা মুক্ত হতে পারে না। আত্মা ও মন পবিত্র হতে পারে একমাত্র তাওবা ও আল্লাহর প্রতি সমর্পিত প্রাণ হবার মাধ্যমে। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে উল্লেখিত হয়েছে ঃ তাঁর হুকুম মোতাবিক এক চোরের হাত কাটার পর তিনি তাকে নিজের কাছে ডেকে আনেন। তাকে বলেন, বলো– قل استغفر الله واتوب اليه (আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি এবং তাঁর কাছে তাওবা করছি।) সে তাঁর নির্দেশ অনুসারে ঐ বাক্যটি বলার পর তিনি তার জন্য দোয়া করেন ঃ اللهم تب عليه (হে আল্লাহ! তাকে মাফ করো)।

৬২. অর্থাৎ যারা জাহেলিয়াতের অবস্থা অপরিবর্তিত রাখার এবং ইসলামের এ সংস্কারমূলক দাওয়াত যাতে ঐ সমস্ত বিকৃতি ও গলদ দূর করতে সক্ষম না হয় সে জন্য নিজেদের সকল প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মতৎপরতা নিয়োজিত করে। তারা সমস্ত নৈতিক বাঁধনমুক্ত হয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে সব রকমের নিকৃষ্টতম চক্রান্ত চালাচ্ছিল। তারা জেনে বুঝে সত্যকে বেমালুম হজম করে যাচ্ছিল। অত্যন্ত নির্লজ্জতা, বেহায়াপনা ও দুঃসাহসের সাথে ধোঁকা, প্রতারণা, জালিয়াতি ও মিথ্যার অস্ত্র ব্যবহার করে এমন এক পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তির কার্যক্রমকে পরাস্ত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল যিনি একান্ত নিস্বার্থভাবে পরোপকার ও নিছক কল্যাণাকাংখার ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের এবং তাদের নিজেদের মংগলের জন্য দিনরাত মেহনত করে যাচ্ছিলেন। তাদের এ তৎপরতা দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে অত্যন্ত মর্মজ্বালা অনুভব করতেন। তাঁর এ মর্মজ্বালা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। যখন কোন পবিত্র ও নিষ্কলুষ ব্যক্তি নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী লোকদের মুখোমুখি হন এবং তারা নিছক নিজেদের মূর্খতা, সংকীর্ণমনতা ও স্বার্থান্ধতার কারণে তাঁর কল্যাণকর ও শুভাকাংখামূলক প্রচেষ্টাবলীর পথ রোধ করার জন্য নিকৃষ্ট ধরনের চালবাজী ও কূটকৌশল অবলম্বন করতে থাকে তখন স্বাভাবিকভাবেই তিনি মনে ব্যাথা পান। কাজেই এখানে আল্লাহর বক্তব্যের উদ্দেশ্য এ নয় যে, তাদের ঐসব কর্মতৎপরতার কারণে রসূলের মনে স্বাভাবিকভাবে যে ব্যাথা ও মর্মবেদনার সৃষ্টি হয় তা না হওয়া উচিত বরং আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, তাঁর মন খারাপ করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি যেন মনোবল না হারিয়ে ফেলেন এবং সবরের সাথে আল্লাহর বান্দাদের সংস্কার ও সংশোধনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। আর এসব লোকের ব্যাপারে বলা যায় যে, এরা যে ধরনের নিকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলী নিজেদের মধ্যে লালন করেছে তাতে তাদের পক্ষ থেকে এ ধরনের ব্যবহারই আশা করা যেতে পারে এবং এ ব্যাপারে তাদের কোন ব্যবহারই অপ্রত্যাশিত নয়।

৬৩. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। এরা যেহেতু প্রবৃত্তির দাসে পরিণত হয়ে গেছে তাই সত্যের সাথে এদের কোন সম্পর্ক নেই। এরা মিথ্যাই পছন্দ করে এবং মনোযোগ সহকারে মিথ্যাই শুনে থাকে। কাজেই এতেই এদের মনের তৃষ্ণা মেটে। আর দ্বিতীয় অর্থটি হচ্ছে, এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের মজলিসে এসে বসে মিথ্যাচারের প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য। এখানে এসে এরা যা কিছু দেখে ও শোনে সেগুলোকে বিপরীত অর্থে প্রয়োগ করে অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে মিথ্যার মিশ্রণ দিয়ে সেগুলোর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের দুর্নাম রটাবার জন্য লোকদের মধ্যে ছড়াতে থাকে।

৬৪. এরও দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, এরা গোয়েন্দা হয়ে আসে। এরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের মজলিসে ঘোরাফেরা করে। কোন গোপন কথা কানে পড়লে তা নিয়ে মুসলমানদের শত্রুদের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে, এরা মিথ্যা দোষারোপ ও নিন্দা করার জন্য তথ্য সংগ্রহ করে বেড়ায় এবং যেসব লোক সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুসলমানদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনি তাদের মধ্যে ভুল ধারণা এবং নবী ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার কাজে লিপ্ত হয়।

৬৫. অর্থাৎ তাওরাতের যেসব বিধান তাদের মনমাফিক নয়, সেগুলোর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে রদবদল করে এবং শব্দের অর্থ পরিবর্তন করে সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছামাফিক বিধান তৈরী করে।

৬৬. অর্থাৎ মূর্খ জনগণকে বলে, আমরা যে বিধান শুনাচ্ছি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যদি এই একই বিধান তোমাদের শোনায় তাহলেই তা গ্রহণ করো, অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করো।

৬৭. আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহ কোন খারাপ প্রবণতা লালিত হতে দেখেন তার সামনে একের পর এক এমন সব সুযোগ সৃষ্টি করে দেন যার ফলে সে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। সে ব্যক্তি যদি এখনো অসৎকর্মের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে না পড়ে থাকে তাহলে এ পরীক্ষাগুলোর মাধ্যমে সে নিজেকে সামলে নেয়। তার মধ্যে অসৎপ্রবৃত্তির মোকাবিলা করার জন্য সৎ–প্রবৃত্তির যে শক্তিগুলো থাকে সেগুলো তীব্র হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যদি সে অসৎ–কর্মের প্রতি পুরোপুরি ঝুঁকে পড়ে থাকে এবং তার সৎপ্রবণতা তার অসৎপ্রবণতার কাছে পরাজিত হয়ে থাকে তাহলে এ ধরনের প্রত্যেকটি পরীক্ষার সময় সে আরো বেশী অসৎপ্রবণতা ও অসৎকর্মের ফাঁদে জড়িয়ে পড়তে থাকবে। এটিই হচ্ছে আল্লাহর সেই ফিত্না বা পরীক্ষা যার হাত থেকে কোন বিকৃত মানসিকতা সম্পন্ন মানুষকে বাঁচানোর ক্ষমতা তার কোন কল্যাণাকাংখীর নেই। আর এ ফিতনার মধ্যে কেবল ব্যক্তিরাই নয় জাতিরাও নিক্ষিপ্ত হয়।

৬৮. কারণ তারা নিজেরাই পবিত্র হতে চায়নি। যে নিজে পবিত্র হতে চায় এবং এ জন্য প্রচেষ্টা ও সাধনা করে তাকে পবিত্রতা থেকে বঞ্চিত করা আল্লাহর নীতি নয়। যে নিজে পবিত্র হতে চায় না আল্লাহ তাকে পবিত্র করতে চান না।

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ ؕ فَاِنْ جَآءُوْكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ
اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ ۚ وَاِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَّضُرُّوْكَ شَيْـًٔا ؕ وَاِنْ
حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۴۲﴾ وَكَيْفَ
يُحَكِّمُوْنَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرٰىةُ فِيْهَا حُكْمُ اللّٰهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ
ذٰلِكَ ؕ وَمَاۤ اُولٰٓئِكَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۴۳﴾

এরা মিথ্যা শ্রবণকারী ও হারাম আহারকারী।[৬৯] কাজেই এরা যদি তোমাদের কাছে (নিজেদের মামলা নিয়ে) আসে তাহলে তোমরা চাইলে তাদের মীমাংসা করে দিতে অথবা অস্বীকার করে দিতে পারো। অস্বীকার করে দিলে এরা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর মীমাংসা করে দিলে যথার্থ ইনসাফ সহকারে মীমাংসা করো। কারণ আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন।[৭০] আর এরা তোমাকে কিভাবে বিচারক মানছে যখন এদের কাছে তাওরাত রয়ে গেছে, যাতে আল্লাহর হুকুম লিখিত আছে আর তারপরও এরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে?[৭১] আসলে এরা ঈমানই রাখে না।

৬৯. এখানে বিশেষ করে তাদের সে সব মুফতী ও বিচারপতিদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে, যারা মিথ্যা সাক্ষ্য নিয়ে ও মিথ্যা বিবরণ শুনে এমন সব লোকদের পক্ষে ইনসাফ ও ন্যায়নীতি বিরোধী ফায়সালা করতো যাদের কাছ থেকে তারা ঘুষ নিতো অথবা যাদের সাথে তাদের অবৈধ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকতো।

৭০. ইহুদীরা তখনো পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মিত প্রজা হিসেবে গণ্য হয়নি। বরং সন্ধি ও চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। এ চুক্তিগুলোর প্রেক্ষিতে ইহুদীরা তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে স্বাধীনতা ভোগ করতো এবং তাদের মামলার ফায়সালা তাদের আইন অনুযায়ীই তাদের নিজেদের বিচারপতিরাই করতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর নিযুক্ত বিচারপতিদের কাছে নিজেদের মামলা-মোকদ্দমা আনার ব্যাপারে আইনের দিক দিয়ে তারা বাধ্য ছিল না। কিন্তু যেসব ব্যাপারে তারা নিজেদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী ফায়সালা করতে চাইতো না সেসব ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতো। তারা আশা করতো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শরীয়াতে হয়তো তাদের জন্য অন্য কোন বিধান আছে এবং এভাবে নিজেদের ধর্মীয় আইনের আনুগত্য করা থেকে তারা নিষ্কৃতি লাভ করতে পারবে।

এখানে বিশেষ করে যে মামলাটির দিকে ইশারা করা হয়েছে সেটি ছিল খয়বরের সম্ভ্রান্ত ইহুদী পরিবার সংক্রান্ত। এ পরিবারগুলোর এক মহিলার সাথে এক পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছিল। তাওরাতের বিধান অনুসারে তাদের শাস্তি ছিল 'রজম' অর্থাৎ উভয়কে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা। (দ্বিতীয় বিবরণী পুস্তক ২২ঃ২৩–২৪) কিন্তু ইহুদীরা এ শাস্তি প্রয়োগ করতে চাচ্ছিল না। তাই তারা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শালিস মানার সিদ্ধান্ত করলো এবং একথাও স্থির করলো যে, যদি তিনি রজম ছাড়া অন্য কোন হুকুম দেন তাহলে তা মেনে নেয়া হবে আর যদি রজমেরই হুকুম দেন তাহলে তা মানা হবে না। কাজেই রসূলের সামনে মামলা পেশ করা হলো। তিনি রজমের হুকুম দিলেন। তারা এ হুকুম মানতে অস্বীকার করলো। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের ধর্মে এর শাস্তির ব্যাপারে কি বিধান আছে? তারা জবাব দিল ঃ বেত্রাঘাত করা এবং মুখে কালি মাখিয়ে গাধার পিঠে চড়িয়ে প্রদক্ষিণ করানো। তিনি তাদের আলেমদেরকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীর ব্যাপারে তাওরাতে কি এ বিধানই আছে? তারা আবার সেই মিথ্যা জবাব দিলেন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে একজন নীরব থাকলেন। তার নাম ছিল ইবনে সূরিয়া। ইহুদীদের বর্ণনা অনুযায়ী সে সময় তাওরাতের তার চেয়ে বড় আলেম আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ আমি তোমাকে সেই আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি যিনি তোমাদের বাঁচিয়েছিলেন ফেরাউনের কবল থেকে এবং তুর পাহাড়ে তোমাদের শরীয়াত দান করেছিলেন, সত্যিই কি তাওরাতে ব্যভিচারের জন্য এ শাস্তির বিধান আছে? ইবনে সূরিয়া জবাব দিলেন ঃ "আপনি আমাকে এ ধরনের কঠিন কসম না দিলে আমি বলতাম না। প্রকৃতপক্ষে রজমই ব্যভিচারের শাস্তি। কিন্তু আমাদের এখানে যখন ব্যভিচার বেড়ে যেতে লাগলো তখন আমাদের শাসকরা এ রীতি অবলম্বন করলো যে, কোন বড় লোক ব্যভিচার করলে তাকে ছেড়ে দিতো এবং গরীবরা এ দুষ্কর্ম করলে তাদেরকে রজম করতো। তারপর এতে যখন জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তখন আমরা তাওরাতের আইনের মধ্যে পরিবর্তন সাধন করে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে বেত্রাঘাত করার এবং তাদের মুখে কালি দিয়ে উল্টো মুখে গাধার পিঠে চড়াবার শাস্তির বিধান দিলাম।" এরপর ইহুদীদের আর কিছু বলার অবকাশ রইলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিনীকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হলো।

৭১. এ আয়াতে আল্লাহ ইহুদীদের দুর্নীতির মুখোস পুরোপুরি উন্মোচন করে দিয়েছেন। এ "ধর্মীয় লোকেরা" সারা আরবে এরূপ প্রচারণার জাল বিস্তার করে রেখেছিল যে, ঐ সমাজে দীনদারী ও "কিতাবী–জ্ঞানের" ব্যাপারে তাদের কোন জুড়ি নেই। এদের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, যে কিতাবকে তারা নিজেরা আল্লাহর কিতাব বলে মানতো এবং তারা যার প্রতি ঈমান রাখে বলে দাবী করতো, তার বিধান পরিহার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে নিজেদের মামলা নিয়ে এসেছিল। অথচ তাঁকে নবী বলে মেনে নিতেও তারা কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। এ থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ ইহুদীরা আসলে কোন জিনিসের ওপরই যথার্থ ঈমান রাখতো না। আসলে তাদের ঈমান ছিল নিজেদের নফ্স ও প্রবৃত্তির ওপর। আল্লাহর কিতাব বলে তারা

إِنَّآ أَنزَلْنَا التَّوْرٰىةَ فِيهَا هُدًى وَّنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبّٰنِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن
كِتٰبِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَآءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ
وَلَا تَشْتَرُوا بِـَٔايٰتِى ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ
فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

৭ রুকূ'

আমি তাওরাত নাযিল করেছি। তাতে ছিল পথ নির্দেশ ও আলো। সমস্ত নবী, যারা মুসলিম ছিল, সে অনুযায়ী এ ইহুদী হয়ে যাওয়া লোকদের[৭২] যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করতো। আর এভাবে রব্বানী ও আহবারও[৭৩] (এরি ওপর তাদের ফায়সালার ভিত্তি স্থাপন করতো)। কারণ তাদেরকে আল্লাহর কিতাব সংরক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল এবং তারা ছিল এর ওপর সাক্ষী। কাজেই (হে ইহুদী গোষ্ঠী!) তোমরা মানুষকে ভয় করো না বরং আমাকে ভয় করো এবং সামান্য তুচ্ছ মূল্যের বিনিময়ে আমার আয়াত বিক্রি করা পরিহার করো। আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী যারা ফায়সালা করে না তারাই কাফের।

তাওরাতে আমি ইহুদীদের জন্য এ বিধান লিখে দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং সব রকমের যখমের জন্য সমপর্যায়ের বদলা।[৭৪] তারপর যে ব্যক্তি ঐ শাস্তি সাদকা করে দেবে তা তার জন্য কাফ্‌ফারায় পরিণত হবে।[৭৫] আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই জালেম।

যাকে মানে তার নির্দেশ তাদের নফ্‌স ও প্রবৃত্তির কাছে অপছন্দনীয় বলেই তারা তাকে মানতে অস্বীকার করে। আর (নাউযুবিল্লাহ) যাকে তারা মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার বলে

وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ ۖ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٦﴾ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤٧﴾

তারপর ঐ নবীদের পরে মারয়ামপুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু তার সামনে ছিল সে তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল। আর তাকে ইনজীল দিয়েছি। তাতে ছিল পথনির্দেশ ও আলো এবং তাও তাওরাতের মধ্য থেকে যা কিছু সে সময় বর্তমান ছিল তার সত্যতা প্রমাণকারী ছিল[৭৬] আর তা ছিল আল্লাহভীরুদের জন্য পথনির্দেশ ও উপদেশ। আমার নির্দেশ ছিল, ইনজীলে আল্লাহ যে আইন নাযিল করেছেন ইনজীল অনুসারীরা যেন সে মোতাবিক ফায়সালা করে। আর যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তারাই ফাসেক।[৭৭]

প্রচার করে বেড়ায় সেখান থেকে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী কোন ফায়সালা লাভ করা যায় কিনা কেবলমাত্র এ আশায় তার কাছে ধর্ণা দেয়।

৭২. এখানে প্রসংগক্রমে এ সত্যটিও প্রকাশ করে দেয়া হয়েছে যে, সকল নবীই ছিলেন মুসলিম। অন্যদিকে এ ইহুদীরা ইসলাম থেকে সরে এসে সাম্প্রদায়িক দলাদলিতে লিপ্ত হয়ে কেবলমাত্র "ইহুদী" হিসেবেই থেকে গিয়েছিল।

৭৩. রব্বানী মানে আলেম এবং আহবার মানে ফকীহ।

৭৪. তুলনামূলক অধ্যয়নের জন্য তাওরাতের যাত্রাপুস্তক ২১ঃ২৩-২৫ দেখুন।

৭৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি সাদকার নিয়েতে কিসাস মাফ করে দেবে তার জন্য এ নেকীটি তার অনেক গোনাহর কাফ্ফারায় পরিণত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত বাণীটি এ অর্থেই উক্ত হয়েছে ঃ

من جرح فى جسده جراحة فتصدق بها كفر عنه ذنوبه بمثل ما تصدق به -

"যার শরীরে কোন আঘাত করা হয়েছে এবং সে তা মাফ করে দিয়েছে, এ ক্ষেত্রে যে পর্যায়ের ক্ষমা হবে ঠিক একই পর্যায়ের গোনাহ মাফ করে দেয়া হবে।"

৭৬. অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম কোন নতুন ধর্ম নিয়ে আসেননি। বরং ইতিপূর্বেকার বিভিন্ন পয়গম্বরের দীনই ছিল তাঁর দীন এবং মানুষকে তিনি এ দীনেরই দাওয়াত দিতেন। তাওরাতের আসল শিক্ষাবলীর যে অংশ তাঁর যুগে সংরক্ষিত ছিল তাকে তিনি নিজেও মানতেন এবং ইনজীলও তার সত্যতা প্রমাণ করতো (মথি ৫ঃ১৭-১৮ দেখুন)। কুরআন বারবার একথাটি ঘোষণা করেছে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে দুনিয়ার বিভিন্ন এলাকায় যত নবী এসেছেন তাদের একজনও পূর্ববর্তী নবীদের প্রতিবাদ করার এবং তাদের কার্যাবলীকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে নিজের নতুন ধর্ম প্রবর্তন করার জন্য আসেননি। বরং প্রত্যেক নবী তাঁর পূর্ববর্তী নবীদের সত্যতার সাক্ষ্য দিতেন এবং পূর্ববর্তী নবীগণ নিজেদের পবিত্র উত্তরাধিকার হিসেবে যেসব কাজ রেখে যেতেন সেগুলোর পরিবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধনের জন্য আসতেন। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোর প্রতিবাদ করার জন্য আল্লাহ কখনো নিজের কোন কিতাব পাঠাননি। বরং তাঁর প্রত্যেকটি কিতাব ইতিপূর্বে প্রেরিত সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও তার সত্যতা প্রমাণকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে।

৭৭. যারা আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী ফায়সালা করে না তাদের সম্পর্কে আল্লাহ এখানে তিনটি বিধান দিয়েছেন। এক, তারা কাফের। দুই, তারা জালেম। তিন, তারা ফাসেক। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুম ও তার নাযিল করা আইন ত্যাগ করে নিজের বা অন্য মানুষের মনগড়া আইনের ভিত্তিতে ফায়সালা করে সে আসলে বড় ধরনের অপরাধ করে। প্রথমত তার এ কাজটি আল্লাহর হুকুম অস্বীকার করার শামিল। কাজেই এটি কুফরী। দ্বিতীয়ত তার এ কাজটি ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতির বিরোধী। কারণ, আল্লাহ যথার্থ ইনসাফ ও ভারসাম্যনীতি অনুযায়ীই হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই আল্লাহর হুকুম থেকে সরে এসে যখন সে ফায়সালা করলো তখন সে আসলে জুলুম করলো। তৃতীয়ত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও যখনই সে নিজের প্রভুর আইন অমান্য করে নিজের বা অন্যের মনগড়া আইন প্রবর্তন করলো তখনই সে আসলে বন্দেগী ও আনুগত্যের গণ্ডীর বাইরে পা রাখলো। আর এটি অবাধ্যতা বা ফাসেকী। এ কুফরী, জুলুম ও ফাসেকী তার নিজের ধরন ও প্রকৃতির দিক দিয়ে অনিবার্যভাবেই পুরোপুরি আল্লাহর হুকুম অমান্যেরই বাস্তব রূপ। যেখানে আল্লাহর হুকুম অমান্য করা হবে সেখানে এ তিনটি বিষয় থাকবে না, এটা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তবে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার যেমন পর্যায়ভেদ আছে তেমনি এ তিনটি বিষয়েরও পর্যায়ভেদ আছে। যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে ভুল এবং নিজের বা অন্য কোন মানুষের হুকুমকে সঠিক মনে করে আল্লাহর হুকুম বিরোধী ফায়সালা করে সে পুরোপুরি কাফের, জালেম ও ফাসেক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর হুকুমকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কিন্তু কার্যত তার বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে ইসলামী মিল্লাত বহির্ভূত না হলেও নিজের ঈমানকে কুফুরী, জুলুম ও ফাসেকীর সাথে মিশিয়ে ফেলছে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সে সকল ব্যাপারেই কাফের, ফাসেক ও জালেম। আর যে ব্যক্তি কিছু ব্যাপারে অনুগত এবং কিছু ব্যাপারে অবাধ্য তার জীবনে ঈমান ও ইসলাম এবং কুফরী, জুলুম ও ফাসেকীর মিশ্রণ ঠিক তেমনি হারে অবস্থান করছে যেহারে সে আনুগত্য ও অবাধ্যতাকে এক সাথে মিশিয়ে রেখেছে। কোন কোন তাফসীরকার এ আয়াতগুলোকে আহ্‌লি কিতাবদের সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কিত বলে গণ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আল্লাহর কালামের শব্দের মধ্যে

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِ ۚ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٤٨﴾

তারপর হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি, যা সত্য নিয়ে এসেছে এবং আল কিতাবের মধ্য থেকে তার সামনে যা কিছু বর্তমান আছে তার সত্যতা প্রমাণকারী[৭৮] ও তার সংরক্ষক।[৭৯] কাজেই তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইনি অনুযায়ী লোকদের বিভিন্ন বিষয়ের ফায়সালা করো এবং যে সত্য তোমার কাছে এসেছে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের খেয়াল–খুশীর অনুসরণ করো না। —তোমাদের[৮০] প্রত্যেকের জন্য একটি শরীয়াত ও একটি কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করে রেখেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদের সবাইকে একই উম্মতের অন্তরভুক্ত করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তার মধ্যে তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য এমনটি করেছেন। কাজেই সৎকাজে একে অপরের চাইতে অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করো। শেষ পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তারপর তিনি সেই প্রকৃত সত্যটি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যে ব্যাপারে তোমরা মতবিরোধ করে আসছিলে।[৮১]

এ ধরনের ব্যাখ্যা করার কোন অবকাশ নেই। হযরত হুযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্যই এ ধরনের ব্যাখ্যার সঠিক ও সর্বোত্তম জবাব। তাঁকে একজন বলেছিল, এ আয়াত তিনটি তো বনী ইসরাঈলের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। সে বুঝাতে চাচ্ছিল যে, ইহুদীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিল করা হুকুমের বিরুদ্ধে ফায়সালা করে সে–ই কাফের, জালেম ও ফাসেক। একথা শুনে হযরত হুযাইফা বলে ওঠেন ঃ

نعم الاخوة لكم بنو اسرائيل ان كانت لهم كل مرة ولكم كل حلوة كلا والله لتسلكن طريقهم قدر الشراك –

"এ বনী ইসরাঈল গোষ্ঠী তোমাদের কেমন চমৎকার ভাই, তিতোগুলো সব তাদের জন্য আর মিঠাগুলো সব তোমাদের জন্য! কখ্খনো নয়, আল্লাহর কসম তাদেরই পথে তোমরা কদম মিলিয়ে চলবে।"

৭৮. এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ বক্তব্যটিকে যদিও এভাবে বলা যেতো যে, "আগের কিতাবগুলোর মধ্য থেকে যা কিছু তার প্রকৃত ও সঠিক অবস্থায় বর্তমান আছে কুরআন তার সত্যতা প্রমাণ করে।" কিন্তু আল্লাহ এখানে "আগের কিতাবগুলোর" পরিবর্তে "আল কিতাব" শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ থেকে এ রহস্য উদঘাটিত হয় যে, কুরআন এবং বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন ভাষায় আল্লাহর পক্ষ থেকে যে কিতাবগুলো নাযিল হয়েছে সবই মূলত একটি কিতাবের অন্তর্ভুক্ত। তাদের রচয়িতাও একজন। তাদের মূল বক্তব্য, উদ্দেশ্য–লক্ষও একই। তাদের শিক্ষাও একই। তাদের মাধ্যমে মানব জাতিকে একই জ্ঞান দান করা হয়েছে। এ কিতাবগুলোর মধ্যে পার্থক্য থাকলে তা আছে কেবল মাত্র ইবারাত অর্থাৎ বাক্য সংগঠন ও বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে। এ ক্ষেত্রে একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কাজেই প্রকৃত সত্য কেবল এতটুকুই নয় যে, এ কিতাবগুলো পরস্পরের বিরোধী নয় বরং সমর্থক এবং পরস্পরের প্রতিবাদকারী নয় বরং সত্যতা প্রমাণকারী। বরং প্রকৃত সত্য এর চাইতেও অনেক বেশী। অর্থাৎ এরা সবাই একই "আল কিতাবের" বিভিন্ন সংস্করণ মাত্র।

৭৯. মূলে "মুহাইমিন" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে হাইমানা, ইউহাইমিনু, হাইমানাতান (هيمن - يهيمن - هيمنة) মানে হচ্ছে দেখাশুনা, সংরক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, সাক্ষ দান, আমানতদারী, সহায়তা দান ও সমর্থন করা। যেমন বলা হয় هيمن الرجل الشيئ অর্থাৎ লোকটি অমুক জিনিসটি হেফাজত ও সংরক্ষণ করেছে। আরো বলা হয় ঃ هيمن الطائر على فراخه অর্থাৎ পাখিটি নিজের বাচ্চাকে নিজের ডানার মধ্যে নিয়ে সংরক্ষিত করে ফেলেছে। হযরত উমর (রা) একবার লোকদের বলেন ঃ انى داع فهيمنوا অর্থাৎ আমি দোয়া করি, তোমরা সমর্থনে আ–মীন বলো। অর্থাৎ কুরআনকে আল–কিতাব বলার পর "মুহাইমিন" বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোতে যেসব সত্য শিক্ষা ছিল কুরআন তার সবগুলোই নিজের মধ্যে সংরক্ষিত করে নিয়েছে। সে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণকারী এই হিসেবে যে, এখন তাদের এ সত্য শিক্ষাগুলোর কোন অংশের নষ্ট হবার আর কোন সম্ভাবনাই নেই। সে সেগুলোর সমর্থক এ অর্থে যে, ঐ কিতাবগুলোতে আল্লাহর কালাম যে অবস্থায় আছে কুরআন তার সত্যতা প্রমাণ করে। সে সেগুলোর ওপর সাক্ষদানকারী এ অর্থে যে, ঐ কিতাবগুলোতে আল্লাহর কালাম ও মানুষের বাণীর মধ্যে যে মিশ্রণ ঘটে গেছে কুরআনের সাক্ষের মাধ্যমে তাকে আবার ছেঁটে আলাদা করা যেতে পারে। সেগুলোর মধ্যে যেগুলো কুরআনের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং তার অনুরূপ সেগুলো আল্লাহর কালাম আর যেগুলো কুরআন বিরোধী সেগুলো মানুষের বাণী।

৮০. এটি একটি প্রসংগ কথা। একটি প্রশ্নের বিশ্লেষণই এর উদ্দেশ্য। ওপরের ধারাবাহিক ভাষণ শোনার পর শ্রোতার মনে এ প্রশ্নটি সংশয় ও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে, সকল নবী ও সকল কিতাব যখন একই ধর্মের দিকে আহবান জানিয়েছে এবং তারা সবাই পরস্পরের সত্যতা প্রমাণ করে ও পরস্পরের সহযোগী তখন

শরীয়াতের বিস্তারিত বিধানের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য কেন? ইবাদাত–বন্দেগীর বাহ্যিক অবয়ব ও আনুষ্ঠানিকতা, হালাল–হারামের বিধি–নিষেধ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আইন–কানুনের খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন নবী ও আসমানী কিতাবসমূহের শরীয়াতগুলোর মধ্যে কমবেশী পার্থক্য দেখা যায় কেন?

৮১. এটি হচ্ছে উপরোল্লিখিত প্রশ্নটির একটি পরিপূর্ণ জবাব। এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ নিছক শরীয়াতের বিভিন্নতা দেখে এ শরীয়াতগুলো বিভিন্ন মূল ও বিভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত হয়েছে বলে মনে করা ভুল হবে। আসলে মহান আল্লাহ বিভিন্ন জাতির জন্য বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন অবস্থায় বিধি বিধান নির্ধারণ করে থাকেন।

দুই ঃ নিসন্দেহে প্রথম থেকেই সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি বিধান নির্ধারিত করে সবাইকে এক উম্মতে পরিণত করা যেতো। কিন্তু বিভিন্ন নবীর শরীয়াতের মধ্যে আল্লাহ যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তার পেছনে বিভিন্ন কারণের মধ্যে একটি বড় কারণ এই ছিল যে, এভাবে আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলেন। যারা প্রকৃত দীন, তার প্রাণসত্তা ও তাৎপর্য অনুধাবন করে, দীনের মধ্যে এ বিধানগুলোর যথার্থ মর্যাদা জানে এবং কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয় না তারা সত্যকে চিনে ফেলবে এবং গ্রহণ করে নেবে, যেভাবেই তা আসুক না কেন। তারা আল্লাহ প্রেরিত আগের বিধানের জায়গায় পরবর্তী বিধান মেনে নেবার ব্যাপারে কোন প্রকার ইতস্তত করবে না। পক্ষান্তরে যারা দীনের মূল প্রাণশক্তি থেকে দূরে অবস্থান করে, দীনের বিধান ও খুটিনাটি নিয়ম–কানুনকেই আসল দীন মনে করে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত জিনিসের গায়ে নিজেরাই তকমা এঁটে দিয়ে সে ব্যাপারে স্থবিরতা ও বিদ্বেষে নিমজ্জিত হয়, তারা পরবর্তীকালে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রত্যেকটি আয়াত প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। এ দুই ধরনের লোককে পৃথক করার জন্য এ ধরনের পরীক্ষা অপরিহার্য ছিল। তাই মহান আল্লাহ বিভিন্ন শরীয়াতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

তিন ঃ সমস্ত শরীয়াতের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নেকী ও কল্যাণ অর্জন করা। যে সময় আল্লাহ যে হুকুম দেন তা পালন করার মাধ্যমেই এগুলো অর্জিত হতে পারে। কাজেই যারা আসল উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে তাদের জন্য শরীয়াতের বিভিন্নতা ও পথের পার্থক্য নিয়ে বিরোধ করার পরিবর্তে আল্লাহর কাছে গৃহীত পথের মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই হচ্ছে সঠিক কর্মপদ্ধতি।

চার ঃ মানুষেরা নিজেদের স্থবিরতা, বিদ্বেষ, হঠকারিতা ও মানসিক অস্থিরতার কারণে নিজেরাই যে সমস্ত বিরোধ সৃষ্টি করেছে, কোন বিতর্কসভায় বা যুদ্ধের ময়দানে সেগুলোর চূড়ান্ত ফায়সালা হবে না। সেগুলোর চূড়ান্ত ফায়সালা করবেন আল্লাহ নিজেই, যেদিন প্রকৃত সত্যকে সকল প্রকার আবরণমুক্ত করে দেয়া হবে। সেদিন লোকেরা দেখবে, যেসব বিরোধের মধ্যে তারা নিজেদের সমগ্র জীবনকাল অতিবাহিত করে দুনিয়া থেকে চলে এসেছে তার মধ্যে "সত্য" কতটুকু ছিল এবং "মিথ্যার" মিশ্রণ কতটুকু।

وَاَنِ احۡكُمۡ بَيۡنَهُمۡ بِمَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعۡ اَهۡوَآءَهُمۡ وَاحۡذَرۡهُمۡ اَنۡ يَّفۡتِنُوۡكَ عَنۡۢ بَعۡضِ مَاۤ اَنۡزَلَ اللّٰهُ اِلَيۡكَ‌ؕ فَاِنۡ تَوَلَّوۡا فَاعۡلَمۡ اَنَّمَا يُرِيۡدُ اللّٰهُ اَنۡ يُّصِيۡبَهُمۡ بِبَعۡضِ ذُنُوۡبِهِمۡ‌ؕ وَاِنَّ كَثِيۡرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوۡنَ ﴿۴۹﴾ اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِيَّةِ يَبۡغُوۡنَ‌ؕ وَمَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ ﴿۵۰﴾

—কাজেই[৮২] হে মুহাম্মাদ! তুমি আল্লাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী তাদের যাবতীয় বিষয়ের ফায়সালা করো এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না। সাবধান হয়ে যাও, এরা যেন তোমাকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করে সেই হেদায়াত থেকে সামান্যতমও বিচ্যুত করতে না পারে, যা আল্লাহ তোমার প্রতি নাযিল করেছেন। যদি এরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখো, আল্লাহ এদের কোন কোন গোনাহর কারণে এদেরকে বিপদে ফেলার সিদ্ধান্তই করে ফেলেছেন। আর যথার্থই এদের অধিকাংশ ফাসেক। (যদি এরা আল্লাহর আইন থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়) তাহলে কি এরা আবার সেই জাহেলিয়াতের[৮৩] ফায়সালা চায়? অথচ যারা আল্লাহর প্রতি দৃঢ় প্রত্যয়ের অধিকারী তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহর চাইতে ভাল ফায়সালাকারী আর কেউ নেই।

৮২. ওপরে যে ধারাবাহিক ভাষণ চলছিল এখান থেকে আবার তা শুরু হচ্ছে।

৮৩. জাহেলিয়াত শব্দটি ইসলামের বিপরীত শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ইসলাম হচ্ছে পুরোপুরি জ্ঞানের পথ। কারণ ইসলামের পথ দেখিয়েছেন আল্লাহ নিজেই। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান রাখেন। অপরদিকে ইসলাম থেকে ভিন্নধর্মী যে কোন পথই জাহেলিয়াতের পথ। আরবের ইসলাম পূর্ব যুগকে জাহেলিয়াতের যুগ বলার কারণ হচ্ছে এই যে, সে যুগে জ্ঞান ছাড়াই নিছক ধারণা, কল্পনা, আন্দাজ, অনুমান বা মানসিক কামনা বাসনার ভিত্তিতে মানুষেরা নিজেদের জন্য জীবনের পথ তৈরী করে নিয়েছিল। যেখানেই যে যুগেই মানুষেরা এ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করবে তাকে অবশ্যি জাহেলিয়াতের কর্মপদ্ধতি বলা হবে। মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে যা কিছু পড়ানো হয় তা নিছক আংশিক জ্ঞান। মানুষকে পথ দেখাবার জন্য এ জ্ঞান কোনক্রমেই যথেষ্ট নয়। কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানকে বাদ দিয়ে এ আংশিক জ্ঞানের মাধ্যমে আন্দাজ, অনুমান, কল্পনা ও লালসা–কামনার মিশ্রণে যে জীবন বিধান তৈরী করা হয়েছে তাও ঠিক প্রাচীন জাহেলী পদ্ধতির মতো জাহেলিয়াতের সংজ্ঞার আওতাভুক্ত হয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَٰرَىٰٓ أَوْلِيَآءَ ۘ بَعْضُهُمْ
أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى
ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥١﴾ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَٰرِعُونَ فِيهِمْ
يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِىَ بِٱلْفَتْحِ
أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِۦ فَيُصْبِحُوا۟ عَلَىٰ مَآ أَسَرُّوا۟ فِىٓ أَنفُسِهِمْ نَٰدِمِينَ ﴿٥٢﴾
وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَهَٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا۟ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَٰنِهِمْ ۙ
إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ ۚ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ فَأَصْبَحُوا۟ خَٰسِرِينَ ﴿٥٣﴾

৮ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ তাদেরকে বন্ধু হিসেবে পরিগণিত করে তাহলে সেও তাদের মধ্যেই গণ্য হবে। অবশ্যি আল্লাহ জালেমদেরকে নিজের পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত রাখেন।

তুমি দেখতে পাচ্ছো, যাদের অন্তরে মোনাফেকীর রোগ আছে তারা তাদের মধ্যেই তৎপর থাকে। তারা বলে, "আমাদের ভয় হয়, আমরা কোন বিপদের কবলে না পড়ে যাই।"[৮৪] কিন্তু অচিরেই আল্লাহ যখন তোমাদের চূড়ান্ত বিজয় দান করবেন অথবা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন কথা প্রকাশ করবেন[৮৫] তখন তারা নিজেদের অন্তরে লুকিয়ে রাখা এ মোনাফেকীর জন্য লজ্জিত হবে। আর সে সময় ঈমানদাররা বলবে, "এরা কি সে সব লোক যারা আল্লাহর নামে শক্ত কসম খেয়ে আমরা তোমাদের সাথে আছি বলে আশ্বাস দিতো?"—এদের সমস্ত কর্মকাণ্ড নষ্ট হয়ে গেছে এবং শেষ পর্যন্ত এরা ব্যর্থ মনোরথ হয়েছে।[৮৬]

৮৪. তখনো পর্যন্ত আরবে কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের কোন মীমাংসা হয়নি। যদিও নিজের অনুসারীদের কর্মতৎপরতা, সাধনা ও আত্মত্যাগের কারণে ইসলাম একটি শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তবুও বিরুদ্ধ শক্তিগুলোও ছিল প্রবল পরাক্রান্ত। ইসলামের বিজয়ের সম্ভাবনা যেমন ছিল তেমনি কুফরের বিজয়ের সম্ভাবনাও ছিল। তাই মুসলমানদের মধ্যে যেসব মোনাফেক বিদ্যমান ছিল তারা ইসলামী দলের মধ্যে থেকেও ইহুদী ও খৃষ্টানদের

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ
بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗٓ ۙ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ز
يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَآئِمٍ ؕ ذٰلِكَ
فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿٥٤﴾ اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ
الزَّكٰوةَ وَهُمْ رٰكِعُوْنَ ﴿٥٥﴾ وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
فَاِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ﴿٥٦﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি দীন থেকে ফিরে যায় (তাহলে ফিরে যাক), আল্লাহ এমনিতর আরো বহু লোক সৃষ্টি করে দেবেন, যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসবেন এবং তারা আল্লাহকে ভালবাসবে, যারা মুমিনদের ব্যাপারে কোমল ও কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর হবে,[৮৭] যারা আল্লাহর পথে প্রচেষ্টা ও সাধনা করে যাবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবে না।[৮৮] এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে চান তাকে দান করেন। আল্লাহ ব্যাপক উপায় উপকরণের অধিকারী এবং তিনি সবকিছু জানেন।

আসলে তোমাদের বন্ধু হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই ঈমানদাররা যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহর সামনে বিনত হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে, তাঁর রসূলকে ও মুমিনদেরকে নিজের বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তার জেনে রাখা দরকার, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে।

সাথেও সম্পর্ক রাখতে চাইতো। তারা ভাবতো, ইসলাম ও কুফরের এ দ্বন্দ্বে যদি ইসলামের পরাজয় ঘটে যায় তাহলে তাদের জন্য যেন কোন একটা আশ্রয় স্থল অবশিষ্ট থাকে। এ ছাড়াও সে সময় আরবে খৃষ্টান ও ইহুদীদের অর্থবল ছিল সবচেয়ে বেশী। মহাজনী ব্যবসায়ের বেশীর ভাগ ছিল তাদের হাতে। আরবের সবচেয়ে উর্বর ও শস্যশ্যামল ভূখণ্ড ছিল তাদের অধিকারে। তাদের সূদখোরীর জাল চারদিকে ছড়িয়ে ছিল। কাজেই অর্থনৈতিক কারণেও এ মোনাফেকরা তাদের সাথে নিজেদের আগের সম্পর্ক অটুট রাখতে চাইতো। তাদের ধারণা ছিল, ইসলাম ও কুফরের এ সংঘর্ষে পুরোপুরি জড়িয়ে পড়ে

আমরা যদি ইসলামের সাথে বর্তমানে বিরোধে ও যুদ্ধে লিপ্ত সম্প্রদায়গুলোর সাথে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করি, তাহলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক দিয়েই এটা হবে আমাদের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক।

৮৫. অর্থাৎ চূড়ান্ত বিজয়ের চাইতে কম পর্যায়ের এমন কোন জিনিস যার মাধ্যমে লোকদের মনে বিশ্বাস জন্মে যে, জয় পরাজয়ের চূড়ান্ত ফায়সালা ইসলামের পক্ষেই হবে।

৮৬. অর্থাৎ ইসলামের বিধান মেনে চলতে গিয়ে তারা যা কিছু করলো ঃ নামায পড়লো, রোযা রাখলো, যাকাত দিল, জিহাদে শরীক হলো, ইসলামী আইনের আনুগত্য করলো—এসব কিছুই এ জন্য নষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলামের ব্যাপারে তাদের মনে আন্তরিকতা ও একনিষ্ঠতা ছিল না এবং তারা সবার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র আল্লাহর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলে একমাত্র তারই অনুগত বান্দায় পরিণত হয়ে যায়নি। বরং নিজেদের পার্থিব স্বার্থের কারণে তারা আল্লাহ ও তাঁর বিদ্রোহীদের মধ্যে নিজেদেরকে অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে রেখেছিল।

৮৭. 'মুমিনদের ব্যাপারে কোমল' হবার মানে হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি ঈমানদারদের মোকাবিলায় কখনো শক্তি প্রয়োগ করবে না। তার বুদ্ধি, মেধা, যোগ্যতা, প্রভাব–প্রতিপত্তি, অর্থ–সম্পদ, শারীরিক ক্ষমতা কোনটিই মুসলমানদেরকে দাবিয়ে রাখার, কষ্ট দেবার বা ক্ষতি করার জন্য ব্যবহার করবে না। মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে তাকে সবসময় একজন দয়ার্দ্র হৃদয়, কোমল স্বভাবের, দরদী ও ধৈর্যশীল মানুষ হিসেবেই দেখতে পায়।

'কাফেরদের ব্যাপারে কঠোর' হবার মানে হচ্ছে, নিজের মজবুত ঈমান, নিস্বার্থ ও একনিষ্ঠ দীনদারী, অনমনীয় নীতিবাদিতা, চারিত্রিক শক্তি ও ঈমানী দূরদৃষ্টির কারণে একজন মুমিন ইসলাম বিরোধীদের মোকাবিলায় পাহাড়ের মতো অটল হবে। নিজের স্থান থেকে তাকে এক চুলও নড়ানো যাবে না। ইসলাম বিরোধীরা কখনো তাকে নমনীয়, দোদুল্যমান এবং অক্লেশে গলধঃকরণ করার মতো খাদ্য মনে করতে পারবে না। যখনই তারা তার মুখোমুখি হয় তখনই টের পেয়ে যায় যে, এ আল্লাহর বান্দা মরে যেতে পারে কিন্তু কখনো কোন মূল্যে বিক্রি হতে পারে না এবং কোন চাপের সামনে নতি স্বীকারও করতে পারে না।

৮৮. অর্থাৎ আল্লাহর দীনের অনুসরণ করার ব্যাপারে তাঁর বিধানসমূহ কার্যকর করার ব্যাপারে এবং এ দীনের দৃষ্টিতে যা সত্য তাকে সত্য এবং যা মিথ্যা তাকে মিথ্যা বলার ব্যাপারে সে আপোষহীন ও নির্ভীক। কারোর বিরোধিতা, নিন্দা, তিরস্কার, আপত্তি ও বিদ্রুপবানের সে পরোয়া করবে না। সাধারণ জনমত যদি ইসলামের প্রতিকূল হয় এবং ইসলামের পথে চলার অর্থ যদি সারা দুনিয়ার সামনে নিজেকে অপাংক্তেয় বানানো হয়ে থাকে তাহলেও সে সাচ্চাদিলে যে পথকে সত্য মনে করেছে সে পথেই চলতে থাকবে।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا دِيْنَكُمْ هُزُوًا
وَّلَعِبًا مِّنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ اَوْلِيَآءَ ۚ
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۵۷﴾ وَاِذَا نَادَيْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ
اتَّخَذُوْهَا هُزُوًا وَّلَعِبًا ؕ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُوْنَ ﴿۵۸﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ
الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّاۤ اِلَّاۤ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْنَا
وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ ۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۵۹﴾

৯ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলি কিতাবদের মধ্য থেকে যেসব লোক তোমাদের দীনকে বিদ্রূপ ও হাসি–তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে তাদেরকে এবং অন্যান্য কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো। যখন তোমরা নামাযের জন্য ডাক দাও তখন তারা এর প্রতি বিদ্রূপবান নিক্ষেপ করে এবং এ নিয়ে টিটকারী ও তামাশা করে।[৮৯] এর কারণ হচ্ছে তাদের জ্ঞান নেই।[৯০] তাদেরকে বলে দাও, "হে আহলি কিতাব! তোমরা আমাদের প্রতি তোমাদের ক্রোধের একমাত্র কারণ তো এই যে, আমরা আল্লাহর ওপর এবং দীনের সে শিক্ষার ওপর ঈমান এনেছি যা আমাদের প্রতি নাযিল হয়েছে এবং আমাদের আগেও নাযিল হয়েছিল। আর তোমাদের বেশীরভাগ লোকইতো অবাধ্য।"

৮৯. অর্থাৎ আযানের আওয়াজ শুনে তা নকল করতে থাকে। ঠাট্টা–তামাশা ও বিদ্রূপ করার জন্য তার শব্দ বদল ও বিকৃত করে এবং তা নিয়ে টিটকারী দেয় ও ভেংচি কাটে।

৯০. অর্থাৎ তাদের এ কাজগুলো নিছক মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার ফল। যদি তারা মূর্খতা ও অজ্ঞতায় নিমজ্জিত না হতো তাহলে মুসলমানদের সাথে ধর্মীয় বিরোধ রাখা সত্ত্বেও এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাজ তারা করতে পারতো না। আল্লাহর ইবাদাতের জন্য আহবান জানানো হলে তা নিয়ে ঠাট্টা–বিদ্রূপ করাকে কোন বিবেকবান ব্যক্তি পছন্দ করতে পারেন না।

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ۚ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٦٠﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَد دَّخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

তাহলে বলো, আমি কি তাদেরকে চিহ্নিত করবো। যাদের পরিণাম আল্লাহর কাছে এ ফাসেকদের চাইতেও খারাপ? বস্তুত যাদের ওপর আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন, যাদের প্রতি তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের মধ্য থেকে কতককে বানর ও শুয়োর বানানো হয়েছে এবং যারা তাগুতের বন্দেগী করেছে, তারা আরো নিকৃষ্ট এবং তারা সাওয়া–উস–সাবীল–(সরল সঠিক পথ) থেকে বিচ্যুত হয়ে অনেক দূরে সরে গেছে।[৯১] যখন তারা তোমাদের কাছে আসে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। অথচ তারা কুফর নিয়ে এসেছিল, কুফর নিয়েই ফিরে গেছে এবং আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন তারা তাদের মনের মধ্যে কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছে। তুমি দেখতে পাচ্ছো, এদের বেশীর ভাগ লোক গোনাহ, জুলুম ও সীমালংঘনের কাজে তৎপর এবং এরা হারাম খায়। এরা অত্যন্ত খারাপ কাজ করে যাচ্ছে।

৯১. এখানে স্বয়ং ইহুদীদের দিকে সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে। তাদের ইতিহাস বলছে, বারবার আল্লাহর গযব ও লানতের শিকার হয়েছে। শনিবারের আইন ভাঙার কারণে তাদের কওমের বহু লোকের চেহারা বিকৃত হয়ে গেছে। এমনকি তারা অধপতনের এমন নিম্নতম পর্যায়ে নেমে গেছে যে, তাদেরকে তাগুত তথা আল্লাহর বিদ্রোহী শক্তির দাসত্ব পর্যন্ত করতে হয়েছে। সার কথা হচ্ছে এই যে, তোমাদের নির্লজ্জতা ও অপরাধমূলক কার্যক্রমের কি কোন শেষ আছে? তোমরা নিজেরা ফাসেকী, শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ ও চরম নৈতিক অধপতনের মধ্যে নিমজ্জিত আছো আর যদি অন্য কোন দল আল্লাহর ওপর ঈমান এনে সাচ্চা দীনদারীর পথ অবলম্বন করে তাহলে তোমরা তার বিরোধিতায় উঠে পড়ে লেগে যাও।

لَوْلَا يَنْهٰهُمُ الرَّبّٰنِيُّوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِثْمَ وَاَكْلِهِمُ
السُّحْتَ ؕ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿۶۳﴾ وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ يَدُ اللّٰهِ
مَغْلُوْلَةٌ ؕ غُلَّتْ اَيْدِيْهِمْ وَلُعِنُوْا بِمَا قَالُوْا ۘ بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ
رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ؕ وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ اِلٰى
يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ؕ كُلَّمَاۤ اَوْقَدُوْا نَارًا لِّلْحَرْبِ اَطْفَاَهَا اللّٰهُ ۙ وَيَسْعَوْنَ
فِى الْاَرْضِ فَسَادًا ؕ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۶۴﴾

এদের উলামা ও মাশায়েখগণ কেন এদেরকে পাপ কথা বলতে ও হারাম খেতে বাধা দেয় না? অবশ্যি এরা যা করে যাচ্ছে তা অত্যন্ত জঘন্য কার্যক্রম।

ইহুদীরা বলে, আল্লাহর হাত বাঁধা,[৯২] আসলে তো বাঁধা হয়েছে ওদেরই হাত[৯৩] এবং তারা যে বাজে কথা বলছে সে জন্য তাদের ওপর অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে।[৯৪] —আল্লাহর হাত তো দরাজ, যেভাবে চান তিনি খরচ করে যান।

আসলে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার ওপর যে কালাম নাযিল করা হয়েছে তা উল্টো তাদের অধিকাংশের বিদ্রোহ ও বাতিলের পূজা বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।[৯৫] আর (এ অপরাধে) আমি তাদের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করে দিয়েছি। যতবারই তারা যুদ্ধের আগুন জ্বালায় ততবারই আল্লাহ তা নিভিয়ে দেন। তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের কখনোই পছন্দ করেন না।

৯২. আরবী প্রবাদ অনুযায়ী কারোর হাত বাঁধা থাকার অর্থ হচ্ছে সে কৃপণ। দান–খয়রাত করার ব্যাপারে তার হাত নিষ্ক্রীয়। কাজেই ইহুদীদের একথার অর্থ এ নয় যে, সত্যিই আল্লাহর হাত বাঁধা রয়েছে। বরং এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ কৃপণ। যেহেতু শত শত বছর থেকে ইহুদী জাতি ঘোর লাঞ্ছনা–বঞ্চনা ও পতিত দশায় নিমজ্জিত ছিল, তাদের অতীতের গৌরব ও কৃতিত্ব নিছক পুরাতন কাহিনীতে পরিণত হয়েছিল এবং সে গৌরবের যুগ ফিরিয়ে আনার আর কোন সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছিল না, তাই সাধারণত নিজেদের অব্যাহত জাতীয় দুর্যোগ ও দৈন্যদশার জন্য আক্ষেপ ও হাহুতাশ করতে গিয়ে ঐ

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ مِّنْ رَّبِّهِمْ لَاَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ ۚ مِنْهُمْ اُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ سَاۤءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ﴿٦٦﴾

যদি (বিদ্রোহের পরিবর্তে) এ আহলি কিতাব গোষ্ঠা ঈমান আনতো এবং আল্লাহ ভীতির পথ অবলম্বন করতো, তাহলে আমি তাদের থেকে তাদের দুষ্কৃতিগুলো মোচন করে দিতাম এবং তাদেরকে পৌছিয়ে দিতাম নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতে। হায়, যদি তারা তাওরাত, ইনজিল ও অন্যান্য কিতাবগুলো প্রতিষ্ঠিত করতো, যা তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল। তাহলে তাদের জন্য রিযিক ওপর থেকেও বর্ষিত হতো এবং নীচে থেকেও উত্থিত হতো।[৯৬] তাদের মধ্যে কিছু লোক সত্যপন্থী হলেও অধিকাংশই অত্যন্ত খারাপ কাজে লিপ্ত।

অজ্ঞ ও নাদান লোকেরা (নাউযুবিল্লাহ) "আল্লাহ তো কৃপণ হয়ে গেছেন, তার ধনাগারের মুখ বন্ধ এবং আমাদের দেবার জন্য তাঁর কাছে আপদ–বিপদ ছাড়া আর কিছুই নেই"—এ বেহুদা কথা বলে বেড়াতো। কেবল যে ইহুদীরাই একথা বলতো, তা নয় বরং অন্যান্য জাতির মূর্খ ও অজ্ঞ গোষ্ঠীরও এ একই অবস্থা ছিল। তাদের ওপর কোন কঠিন সময় এলে তারা আল্লাহর কাছে নত হওয়ার পরিবর্তে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে এ ধরনের বেআদবীমূলক কথা বলতো।

৯৩. অর্থাৎ এরা নিজেরাই কৃপণতায় নিমজ্জিত। নিজেদের কৃপণতা ও সংকীর্ণমনতার জন্য তারা সারা দুনিয়ায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে।

৯৪. অর্থাৎ এ ধরনের গোস্তাখী ও বিদ্রূপাত্মক কথা বলে এরা যদি মনে করে থাকে যে, আল্লাহ এদের প্রতি করুণাশীল হবেন এবং এদের ওপর তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করতে থাকবেন, তাহলে এদের জেনে রাখা দরকার, এটা কোনক্রমেই সম্ভবপর নয়। বরং এদের এ কথাগুলোর ফলে এরা আল্লাহর অনুগ্রহের দৃষ্টি থেকে আরো বেশী বঞ্চিত হয়েছে এবং তাঁর করুণা ও রহমত থেকে আরো দূরে সরে গেছে।

৯৫. অর্থাৎ এ কালাম শুনে তারা কোন ভাল ও সুফলদায়ক শিক্ষা গ্রহণ এবং নিজেদের ভুল ও বিভ্রান্ত কার্যকলাপ সম্পর্কে সতর্ক হয়ে তার ক্ষতিপূরণ করার ও নিজেদের অধপতিত অবস্থার কারণ জেনে তার সংশোধন করার দিকে নজর দেবার পরিবর্তে উল্টো তাদের ওপর এর এরূপ প্রভাব পড়েছে যে, জিদের বশবর্তী হয়ে তারা

يٰۤاَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ؕ وَاِنْ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسٰلَتَهٗ ؕ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۶۷﴾ قُلْ يٰۤاَهْلَ الْكِتٰبِ لَسْتُمْ عَلٰى شَىْءٍ حَتّٰى تُقِيْمُوا التَّوْرٰىةَ وَالْاِنْجِيْلَ وَمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ ؕ وَلَيَزِيْدَنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ مَّاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَّكُفْرًا ۚ فَلَا تَاْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۶۸﴾

১০ রুকূ'

হে রসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার কাছে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তা মানুষের কাছে পৌঁছাও। যদি তুমি এমনটি না করো তাহলে তোমার দ্বারা তার রিসালাতের হক আদায় হবে না। মানুষের অনিষ্টকারিতা থেকে তোমাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন। নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো, তিনি কখনো কাফেরদেরকে (তোমার মোকাবিলায়) সফলতার পথ দেখাবেন না। পরিষ্কার বলে দাও, "হে আহ্‌লি কিতাব! তোমরা কখনোই কোন মূল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে না। যতক্ষণ না তোমরা তাওরাত, ইন্‌জীল ও তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে নাযিল করা অন্যান্য কিতাবগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করবে।"[৯৭]

তোমার ওপর এই যে ফরমান নাযিল করা হয়েছে এটা অবশ্যি তাদের অনেকের গোয়ার্তুমী ও অবিশ্বাস আরো বাড়িয়ে দেবে।[৯৮] *কিন্তু অস্বীকারকারীদের অবস্থার জন্য কোন দুঃখ করো না।*

সত্যের বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। সৎকর্ম ও আত্মশুদ্ধির বিস্মৃত শিক্ষার কথা শুনে তাদের নিজেদের সত্য পথে ফিরে আসা তো দূরের কথা, উল্টো তারা এ শিক্ষাকে স্মরণ করিয়ে দেবার আহবান যাতে অন্যেরাও শুনতে না পারে এ জন্য তাকে দাবিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৯৬. বাইবেলের লেবীয় পুস্তক (২৬ অনুচ্ছেদ) ও দ্বিতীয় বিবরণে (২৮ অনুচ্ছেদ) হযরত মূসা আলাইহিস সালামের একটি ভাষণ উদ্বৃত হয়েছে। এ ভাষণে তিনি বিস্তারিতভাবে বনী ইসরাঈল জাতিকে একথা জানিয়ে দিয়েছেন যে, তোমরা পুরোপুরি ও যথাযথভাবে আল্লাহর বিধান অনুসরণ করে চললে আল্লাহর রহমত ও বরকত কিভাবে তোমাদের ওপর

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٩﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ۚ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿٧١﴾

(নিশ্চিতভাবে জেনে রাখো এখানে কারোর ইজারাদারী নেই।) মুসলমান হোক বা ইহুদী; সাবী হোক বা খৃষ্টান যে–ই আল্লাহ ও আখেরাতের ওপর ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে নিসন্দেহে তার কোন ভয় বা মর্ম বেদনার কারণ নেই।৯৯

বনী ইসরাঈলের থেকে পাকাপোক্ত অংগীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের কাছে অনেক রসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু যখনই তাদের কাছে কোন রসূল তাদের প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা বিরোধী কিছু নিয়ে হাযির হয়েছেন তখনই কাউকে তারা মিথ্যুক বলেছে এবং কাউকে হত্যা করেছে আর এতে কোন ফিত্‌না সৃষ্টি হবে না ভেবে তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেছে। তারপর আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন। এতে তাদের অনেকেই আরো বেশী অন্ধ ও বধির হয়ে চলেছে। আল্লাহ তাদের এসব কাজ পর্যবেক্ষণ করে যাচ্ছেন।

বর্ষিত হবে এবং আল্লাহর কিতাবকে পেছনে ফেলে দিয়ে তাঁর নাফরমানী করতে থাকলে কিভাবে বালা–মুসিবত আপদ–বিপদ ও ধ্বংস চতুরদিক থেকে তোমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। হযরত মূসার ভাষণটি কুরআনের এ সংক্ষিপ্ত বাক্যটির চমৎকার ব্যাখ্যা।

৯৭. তাওরাত ও ইনজীলকে প্রতিষ্ঠিত করার মানে হচ্ছে, সততা ও নিষ্ঠার সাথে তাদের অনুসরণ করা এবং তাদেরকে নিজের জীবন বিধানে পরিণত করা। এ প্রসংগে একথাটি ভালভাবে হৃদয়ংগম করে নিতে হবে যে, বাইবেলের পবিত্র পুস্তক সমষ্টিতে এক ধরনের বাণী আছে, যেগুলো ইহুদী ও খৃষ্টান লেখকরা নিজেরাই রচনা করে লিখে দিয়েছেন আর এক ধরনের বাণী সেখানে আছে, যেগুলো আল্লাহর বাণী বা হযরত ঈসা

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ ۖ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يٰبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ اعْبُدُوا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ ۖ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَاْوٰىهُ النَّارُ ۖ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, মারয়াম পুত্র মসীহ্ই আল্লাহ। অথচ মসীহ্ বলেছিল, "হে বনী ইসরাঈল! আল্লাহর বন্দেগী করো, যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব! যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করেছে তার ওপর আল্লাহ জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর এ ধরনের জালেমদের কোন সাহায্যকারী নেই।

আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য পয়গম্বরের বাণী হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে এবং যেগুলোতে একথা সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ একথা বলেছেন বা অমুক নবী একথা বলেছেন। বাইবেলের এ বচনগুলোর মধ্য থেকে প্রথম ধরনের বচনগুলোকে আলাদা করে যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র দ্বিতীয় ধরনের বাণীগুলোর মধ্যে অনুসন্ধান চালান, তাহলে তিনি সহজেই দেখতে পাবেন সেগুলোর শিক্ষা ও কুরআনের শিক্ষার মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই। অনুবাদক, অনুলেখক ও ব্যাখ্যাতাগণের হস্তক্ষেপ এবং কোথাও কোথাও ঐশী বর্ণনাকারীদের ভুলের কারণে এ দ্বিতীয় ধরনের বাণীগুলোও পুরোপুরি অবিকৃত নেই তবুও প্রত্যেক ব্যক্তি নিসন্দেহে একথা অনুভব করবেন যে, কুরআন যে নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে চলেছে এগুলোর মধ্যেও ঠিক সেই একই নির্ভেজাল তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে। কুরআন যে আকীদা বিশ্বাসের কথা উপস্থাপন করেছে এখানেও সেই একই আকীদা বিশ্বাস উপস্থাপিত হয়েছে। কুরআন যে জীবন পদ্ধতির দিকে পথনির্দেশ করেছে এখানেও সেই একই জীবন পদ্ধতির নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কাজেই ইহুদী ও খৃষ্টানরা যদি তাদের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ ও নবীদের পক্ষ থেকে উদ্ধৃত প্রকৃত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতো তাহলে নিসন্দেহে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবকালে তাদেরকে একটি ন্যায়বাদী ও সত্যপন্থী দল হিসেবে পাওয়া যেতো। এ ক্ষেত্রে তারা কুরআনের মধ্যে সেই একই আলো দেখতে পেতো, যা পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর মধ্যে পাওয়া যেতো। এ অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করার জন্য তাদের ধর্ম পরিবর্তন করার আদতে কোন প্রশ্নই দেখা দিতো না। বরং যে পথে তারা চলে আসছিল সে পথের ধারাবাহিক পরিণতি হিসেবেই তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী হয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারতো।

৯৮. অর্থাৎ একথা শোনার পর তারা স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করার ও যথার্থ সত্য হৃদয়ংগম করার পরিবর্তে একগুঁয়েমী ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আরো বেশী কঠোরভাবে বিরোধিতা শুরু করে দেবে।

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلٰثَةٍ ۘ وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّآ اِلٰهٌ
وَّاحِدٌ ۚ وَاِنْ لَّمْ يَنْتَهُوْا عَمَّا يَقُوْلُوْنَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٧٣﴾ اَفَلَا يَتُوْبُوْنَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُوْنَهٗ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ﴿٧٤﴾ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ اِلَّا رَسُوْلٌ ۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ
وَاُمُّهٗ صِدِّيْقَةٌ ۚ كَانَا يَاْكُلٰنِ الطَّعَامَ ۚ اُنْظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ
الْاٰيٰتِ ثُمَّ انْظُرْ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿٧٥﴾

নিসন্দেহে তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে, আল্লাহ তিন জনের মধ্যে একজন। অথচ এক ইলাহ্ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই যদি তারা নিজেদের এই সব কথা থেকে বিরত না হয়, তাহলে তাদের মধ্য থেকে যারা কুফরী করেছে তাদেরকে যন্ত্রণা দায়ক শাস্তি দেয়া হবে। তবে কি তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করবে না এবং তাঁর কাছে মাফ চাইবে না? আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

মারয়াম পুত্র মসীহ্ তো একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই ছিল না? তার পূর্বেও আরো অনেক রসূল অতিক্রান্ত হয়েছিল। তার মা ছিল একজন সত্যনিষ্ঠ মহিলা। তারা দু'জনই খাবার খেতো। দেখো কিভাবে তাদের সামনে সত্যের নিদর্শনগুলো সুস্পষ্ট করি। তারপর দেখো তারা কিভাবে উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছে।[১০০]

৯৯. সূরা আল বাকারার ৮ রুকূ'র ৮০ টীকা দেখুন।

১০০. এখানে মাত্র কয়েকটি শব্দের মাধ্যমে ঈসার 'আল্লাহ' হওয়া সম্পর্কিত খৃষ্টীয় আকীদার এমন সুস্পষ্ট প্রতিবাদ করা হয়েছে যে, এর চাইতে ভাল ও দ্ব্যর্থহীনভাবে আর কোন প্রতিবাদ করা সম্ভবপর নয়। হযরত ঈসা মসীহ্ সম্পর্কে যদি কেউ জানতে চায় যে, তিনি আসলে কি ছিলেন তাহলে এ আলামতগুলো থেকে সম্পূর্ণ সন্দেহাতীতভাবে সে জানতে পারবে যে, তিনি নিছক একজন মানুষ ছিলেন। মোট কথা, যার জন্ম এক মহিলার গর্ভে, যার একটি বংশ তালিকা আছে, যিনি মানবিক দেহের অধিকারী ছিলেন, যিনি এমন সব সীমারেখা ও নিয়ম–কানুনের চার দেয়ালে আবদ্ধ এবং এমন সব গুণাবলী সমন্বিত, যা একমাত্র মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট। যিনি ঘুমাতেন, খেতেন, ঠাণ্ডা–গরম অনুভব

قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٧٦﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

তাদেরকে বলো, তোমরা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন কিছুর ইবাদাত করছো, যা তোমাদের না ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা রাখে না উপকারের? অথচ একমাত্র আল্লাহই তো সবার সবকিছু শোনেন ও জানেন। বলে দাও, হে আহলি কিতাব! নিজেদের দীনের ব্যাপারে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং তাদের খেয়ালখুশীর অনুসরণ করো না যারা তোমাদের পূর্বে নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং আরো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে আর 'সাওয়া-উস-সাবীল' থেকে বিচ্যুত হয়েছে।[১০১]

করতেন, এমনকি যাঁকে শয়তানের মাধ্যমে পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাঁর সম্পর্কে কোন বিবেকবান ব্যক্তি একথা কল্পনাই করতে পারেন না যে, তিনি নিজে আল্লাহ বা আল্লাহর কাজে তাঁর সাথে শরীক ও তাঁর সমকক্ষ। তাছাড়া খৃষ্টানরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলোতে হযরত মসীহ আলাইহিস সালামের জীবনকে সুস্পষ্টভাবে একটি মানুষের জীবন হিসেবে পেয়েছে। এরপরও তারা তাঁকে আল্লাহর গুণাবলী সমন্বিত পূজনীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জোর দিয়ে যাচ্ছে। এটাকে মানব মনের বিভ্রান্তি ও গোমরাহী প্রীতির এক অদ্ভুত প্রবণতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে? আসলে যে ঈসা মসীহ্ আলাইহিস সালামের আবির্ভাব বাস্তবে ঘটেছিল সে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ঈসা মসীহ্কে তারা মানে না। বরং তারা নিজেদের মনোজগতে ঈসার এক উদ্ভট কাল্পনিক ভাবমূর্তি নির্মাণ করে তাকেই আল্লাহর স্থানে বসিয়ে দিয়েছে।

১০১. যেসব গোমরাহ জাতি থেকে খৃষ্টানরা ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বাতিল পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল এখানে তাদের দিকে ইংগিত করা হয়েছে। বিশেষ করে এখানে গ্রীক দার্শনিকদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। তাদের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে খৃষ্টানরা সেই সিরাতে মুস্তাকীম—সরল সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল, যেদিকে প্রথমত তাদেরকে পরিচালিত করা হয়েছিল। হযরত ঈসার প্রথম দিকের অনুসারীরা যে আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করতেন তা বেশীর ভাগ তাদের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলব্ধ সত্য ছিল এবং তাদের নেতা ও পথপ্রদর্শক তাদেরকে সেগুলো শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের খৃষ্টানরা একদিকে ঈসার প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শনের প্রশ্নে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে

এবং অন্যদিকে প্রতিবেশী জাতিসমূহের অলীক ধ্যান–ধারণা ও দর্শনে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আকীদা–বিশ্বাসের বানোয়াট দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে শুরু করে। এভাবে তারা একটি সম্পূর্ণ নতুন ধর্ম তৈরী করে ফেলে। এ নতুন ধর্মের সাথে হযরত ঈসার আসল শিক্ষাবলীর দূরতম কোন সম্পর্কও ছিল না। এ ব্যাপারে একজন খৃষ্টান ধর্মতত্ত্ববিদ রেভারেণ্ড চার্লস এণ্ডারসন স্কটের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার চতুর্দশ সংস্করণে "ঈসা মসীহ" (JESUS CHRIST) শিরোনামে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাতে তিনি লিখছেন ঃ

"প্রথম তিনটি ইনজীলে (মথি, মার্ক ও লুক) এমন কোন জিনিস নেই যা থেকে ধারণা করা যেতে পারে যে, এ তিনটি ইনজীলের লেখকরা ঈসাকে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু মনে করতেন। তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন একজন মানুষ। এমন একজন মানুষ যিনি বিশেষভাবে আল্লাহর আত্মা থেকে সঞ্জীবিত হয়েছিলেন এবং আল্লাহর সাথে এমন একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রাখতেন যে জন্য তাঁকে যদি আল্লাহর পুত্র বলা হয় তাহলে তা ন্যায়সংগত হবে। মথি নিজে তাঁর উল্লেখ করেছেন কাঠ মিস্ত্রীর পুত্র হিসেবে। এক জায়গায় তিনি বলছেন, পিতর তাঁকে "মসীহ্" মেনে নেবার পর 'তাঁকে আলাদা একদিকে ডেকে নিয়ে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন।' (মথি ১৬, ২২) লুক–এ আমরা দেখছি ক্রুশবিদ্ধ হবার ঘটনার পর হযরত ঈসার দু'জন শাগরিদ ইম্মায়ু নামক গ্রামের দিকে যাবার সময় নিম্নোক্তভাবে এর উল্লেখ করেছেন, "তিনি আল্লাহর ও সকল লোকের সাক্ষাতে কাজে ও কথায় পরাক্রমী নবী ছিলেন।" (লুক ২৪, ১৯) একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, যদিও মার্কের রচনার পূর্বেই খৃষ্টানদের মধ্যে ঈসার জন্য 'প্রভু' (Lord) শব্দটির ব্যবহার সাধারণভাবে প্রচলিত হয়ে পড়েছিল তবুও মার্কের ইনজীলে ঈসাকে কোথাও এ শব্দের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়নি এবং মথির ইনজিলেও নয়। অন্যদিকে এ দুটি পুস্তকে এ শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর জন্য। ঈসার বিপদের ঘটনা যেভাবে বর্ণনা করা দরকার ঠিক তেমনি জোরে শোরে, তিনটি ইনজীলেই বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু মার্কের 'মুক্তিপণ' সম্বলিত বাণী (মার্ক ১০, ৪৫) ও শেষ উপদেশের সময়ের কয়েকটি শব্দ বাদ দিলে এ ইনজিলগুলোর কোথাও এ ঘটনার এমন অর্থ গ্রহণ করা হয়নি যা পরবর্তীকালে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি ঈসার মৃত্যুর সাথে মানুষের পাপ মোচনের কোন সম্পর্ক ছিল, এ মর্মে কোথাও সামান্যতম ইংগিতও করা হয়নি।"

পরবর্তী পর্যায়ে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"ইনজীলগুলোর বিভিন্ন বাক্য থেকে একথা প্রমাণ হয় যে, ঈসা নিজেকে একজন নবী হিসেবে পেশ করতেন। যেমন, 'আমাকে আজ, কাল ও পরশু অবশ্যি নিজের পথে চলতে হবে। কারণ জেরুশালেমের বাইরে কোন নবী মারা যাবে—এমনটি হতে পারে না।' (লুক ১৩, ৩৩)–তিনি অধিকাংশ সময় নিজেকে 'আদম সন্তান' বলে উল্লেখ করেছেন।...... ঈসা কোথাও নিজেকে আল্লাহর পুত্র বলেননি। তার সমকালীন অন্য কেউ যখন তার সম্পর্কে এ শব্দটি ব্যবহার করেন তখন সম্ভবত তার মর্মার্থ এটাই হয় যে, তিনি তাকে 'মসীহ্' মনে করেন তবে তিনি নিজেকে ব্যাপক অর্থে 'পুত্র' বলে

উল্লেখ করেছেন।........এ ছাড়া আল্লাহর সাথে নিজের সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্যও তিনি 'পিতা' শব্দটিকেও এ ব্যাপক অর্থেই ব্যবহার করেছেন। ....আল্লাহর সাথে কেবল তাঁর একার এ সম্পর্ক আছে বলে তিনি মনে করতেন না। বরং প্রাথমিক যুগে অন্যান্য মানুষেরও আল্লাহর সাথে এ ধরনের বিশেষ গভীর সম্পর্ক ছিল এবং এ ব্যাপারে তিনি তাদেরকে নিজের সাথী মনে করতেন। তবে পরবর্তীকালের অভিজ্ঞতা এবং মানবিক প্রকৃতির গভীর অধ্যয়ন তাঁকে একথা বুঝতে বাধ্য করে যে, এ ব্যাপারে তিনি একা।"

প্রবন্ধকার সামনে অগ্রসর হয়ে আরো লিখেছেন ঃ

"পুনৃতেকুসৃতের ঈদের সময় পিতরের এ কথাগুলো—'একজন মানুষ যিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত ছিলেন'—ঈসাকে এমনভাবে পেশ করে যেমন তাঁর সমকালীনরা তাঁকে জানতো ও বুঝতো। ..... ইনজীলগুলো থেকে আমরা জানতে পারি, শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত ঈসা সম্পূর্ণ স্বাভাবিকভাবে শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভের পর্যায় অতিক্রম করেন। তাঁর ক্ষুধা ও পিপাসা লাগতো। তিনি ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হতেন এবং ঘুমিয়ে পড়তেন। তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হতে পারতেন এবং তার ভালমন্দ জিজ্ঞেস করার মুখাপেক্ষী হতেন। তিনি দুঃখ সয়েছেন এবং মরে গেছেন। তিনি কেবল সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা হবার দাবীই করেননি বরং সুস্পষ্ট ভাষায় এগুলো অস্বীকার করেছেন।...... আসলে যদি দাবী করা হয় যে, তিনি সর্বত্র উপস্থিত ও সর্বদ্রষ্টা, তাহলে ইনজীল থেকে আমরা যে ধারণা পাই এটা হবে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। বরং তাঁর পরীক্ষার ঘটনা এবং গিতাসৃমনী ও খোপড়ী নামক স্থানে যা কিছু ঘটেছিল সেগুলোকে সম্পূর্ণ অবাস্তব বলে ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত এ দাবীর সাথে সেগুলোর কোন একটিরও কোন সামঞ্জস্য দেখানো যেতে পারে না। একথা অবশ্যি মানতে হবে, মসীহ্ যখন এ সমস্ত অবস্থার চড়াই উতরাই অতিক্রম করেছেন তখন তিনি মানবিক জ্ঞানের সাধারণ সীমাবদ্ধতার অধিকারী ছিলেন। এ সীমাবদ্ধতার মধ্যে কোন ব্যতিক্রম থেকে থাকলে তা কেবল এতটুকু হতে পারে যা নবী সুলভ অন্তর্দৃষ্টি ও আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহাতীত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের মাধ্যমে তিনি অর্জন করেছিলেন। তাছাড়া মসীহ্‌কে সর্বশক্তিমান মনে করার অবকাশ ইনজীলে আরো কম। ইনজীলের কোথাও এতটুকু ইংগিত পাওয়া যাবে না যে, ঈসা আল্লাহর মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই স্বাধীনভাবে সমস্ত কাজ করতেন। বরং উল্টো তাঁর বারবার দোয়া চাওয়ার অভ্যাস থেকে এবং এ বিপদটির হাত থেকে দোয়া ছাড়া আর কোন উপায়ে রেহাই পাওয়া যাবে না"—এ ধরনের বাক্য থেকে একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, তাঁর সত্তা আল্লাহর ওপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। যদিও খৃষ্টীয় গীর্জাসমূহ যখন থেকে ঈসাকে 'ইলাহ' ও 'আল্লাহ' মনে করতে শুরু করেছে, তার পূর্বে ইনজীল গ্রন্থসমূহ সংকলন ও লিপিবদ্ধ করার কাজ সম্পূর্ণ হতে পারেনি, তবুও এ প্রমাণ পত্রগুলোতে একদিকে ঈসা যে যথার্থই একজন মানুষ, তার সাক্ষ্য সংরক্ষিত রয়ে গেছে এবং অন্যদিকে এগুলোর মধ্যে ঈসা নিজেকে আল্লাহ মনে করতেন, এমন কেন সাক্ষ প্রমাণ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়টি ইনজীলগুলোর ঐতিহাসিক নির্ভরযোগ্যতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।"

অতপর এ প্রবন্ধকার আরো লিখেছেন ঃ

"আসমানে উঠিয়ে নেবার ঘটনার সময় এ উঠিয়ে নেবার মাধ্যমে ঈসাকে পূর্ণ ক্ষমতা সহকারে প্রকাশ্যে 'আল্লাহর পুত্রের' মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়েছে, একথা সেন্টপলই ঘোষণা করেছিলেন। এ 'আল্লাহর পুত্র' শব্দটির মধ্যে নিশ্চিতভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে পুত্র হবার একটি ইংগিত নিহিত রয়েছে এবং সেন্টপল অন্য এক জায়গায় ঈসাকে 'আল্লাহর নিজের পুত্র' বলে সেই ইংগিতটিকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। মসীহের জন্য 'বিধাতা বা প্রভু' বা ঈশ্বর শব্দটির আসল ধর্মীয় অর্থে ব্যবহার প্রথমে কে করেছিলেন, প্রথম খৃষ্টীয় দলটি, না সেন্টপল, এ বিষয়ের মীমাংসা করা এখন আর সম্ভবপর নয়। সম্ভবত প্রথমোক্ত দলটিই এর উদ্ভাবক। কিন্তু নিসন্দেহে সেন্টপলই এ সম্বোধনটির সর্বপ্রথম পূর্ণ অর্থে ব্যবহার শুরু করেন। তারপর 'ঈসা মসীহ' সম্পর্কে তিনি এমন অনেক চিন্তাধারা ও পারিভাষিক শব্দ প্রয়োগ করেন যেগুলো প্রাচীন পবিত্র গ্রন্থাদিতে একমাত্র 'ঈশ্বর ইহওয়া' (আল্লাহ তাআলা'র) জন্য বলা হয়েছে। এভাবে নিজের বক্তব্যকে তিনি আরো বেশী সুস্পষ্ট করে তোলেন। এ সংগে মসীহ্‌কে তিনি আল্লাহর জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও মর্যাদার ক্ষেত্রে সমপর্যায়ভুক্ত করেন এবং ব্যাপক ও সাধারণ অর্থে তাঁকে আল্লাহর পুত্র গণ্য করেন। তবুও বিভিন্ন দিক থেকে আল্লাহর সমপর্যায়ভুক্ত করে দেবার পরও সেন্টপল তাঁকে চূড়ান্তভাবে আল্লাহ বলতে বিরত থাকেন।"

ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার আর একজন প্রবন্ধকার রেভারেণ্ড জর্জ উইলিয়ম ফক্স তাঁর 'খৃষ্টবাদ' (Christianity) শীর্ষক প্রবন্ধে খৃষ্টীয় গীর্জার মৌলিক বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসংগে লিখছেন ঃ

"ত্রিত্ববাদী বিশ্বাসের চিন্তাগত কাঠামো গ্রীক দেশীয়। এর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে ইহুদী শিক্ষা। এদিক দিয়ে বিচার করলে এটি আমাদের জন্য একটি অদ্ভুত ধরনের যৌগিক। ধর্মীয় চিন্তাধারা বাইবেল থেকে উৎসারিত কিন্তু তা ঢেলে সাজানো হয়েছে এক অপরিচিত দর্শনের আকারে। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার পরিভাষা ইহুদী সূত্রে লাভ করা হয়েছে। শেষ পরিভাষাটি যীশু (ঈসা) নিজে খুব কমই কখনো কখনো ব্যবহার করেছিলেন। আর পল নিজেও এটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে এর অর্থ সম্পূর্ণ অস্পষ্ট ছিল। তবুও ইহুদী সাহিত্যে এ শব্দটি ব্যক্তিত্বের রূপ গ্রহণ করার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কাজেই এ বিশ্বাসটির মৌল উপাদান ইহুদীবাদ থেকে গৃহীত (যদিও এ যৌগিকের অন্তরভুক্ত হবার আগেই এটি গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল) এবং বিষয়টি নির্ভেজাল গ্রীকদেশীয়। যে প্রশ্নটির ভিত্তিতে এ বিশ্বাস গড়ে ওঠে সেটি কোন নৈতিক বা ধর্মীয় প্রশ্ন ছিল না। বরং সেটি ছিল আগাগোড়া একটি দার্শনিক প্রশ্ন। অর্থাৎ এ তিনটি পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা সত্তার মধ্যে সম্পর্কের স্বরূপ কি? গীর্জা এ প্রশ্নের যে জবাব দিয়েছে তা নিকিয়া কাউন্সিলে নির্ধারিত আকীদার মধ্যে সংযুক্ত হয়েছে। সেটি দেখার পর পরিষ্কার জানা যায়, ওটা পুরোপুরি গ্রীক চিন্তারই সমষ্টি।

এ প্রসংগে ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকায় 'চার্চের ইতিহাস' (Church History) শিরোনামে লিখিত অন্য একটি নিবন্ধের নিম্নোক্ত বক্তব্যটিও উল্লেখযোগ্য ঃ

"খৃষ্টীয় তৃতীয় শতক শেষ হবার আগে মসীহ্কে সাধারণভাবে 'বাণী'র দৈহিক প্রকাশ হিসেবে মেনে নেয়া হয়েছিল। তবুও অধিকাংশ খৃষ্টান মসীহর 'ইলাহ' হওয়ার স্বীকৃতি দেয়নি। চতুর্থ শতকে এ বিষয়টির ওপর তুমুল বাকবিতণ্ডা শুরু হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে গীর্জার ভিত্ নড়ে উঠেছিল। অবশেষে ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিয়া কাউন্সিল মসীহ্কে সরকারীভাবে যথারীতি ইলাহ বা ঈশ্বর হিসেবে ঘোষণা করে। সে সাথে এটিকে খৃষ্টীয় আকীদা বলেও গণ্য করে এবং সুনির্দিষ্ট শব্দাবলী সমন্বয়ে সেটি রচনা করে। এরপরও কিছুকাল পর্যন্ত বিতর্ক চলতে থাকে। কিন্তু শেষ বিজয় হয় নিকিয়া কাউন্সিলের সিদ্ধান্তেরই। পূর্বে ও পশ্চিমে এ সিদ্ধান্তকে যেভাবে মেনে নেয়া হয় তাতে যেন একথা স্বীকৃতি লাভ করে যে, নির্ভুল আকীদা সম্পন্ন খৃষ্টান হতে হলে তাকে অবশ্যি এর ওপর ঈমান আনতে হবে। পুত্রকে 'ইলাহ' বলে মেনে নেবার সাথে সাথে 'পবিত্র আত্মাকে'ও ইলাহ বলে মেনে নেয়া হয়। তাকে ধর্মান্তর গ্রহণের মন্ত্র এবং প্রচলিত ঐতিহ্যসমূহের মধ্যে পিতা ও পুত্রের সাথে এক সারিতে জায়গা দেয়া হয়। এভাবে নিকিয়ায় মসীহর যে ধারণা প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে তার ফলে ত্রিত্ববাদ খৃষ্ট ধর্মের অবিচ্ছিন্ন অংগ গণ্য হয়েছে।

তারপর "পুত্রের 'ইলাহ' হবার তত্ত্বটি ঈসার ব্যক্তিসত্তায় রূপায়িত হয়েছিল"—এ দাবী আর একটি সমস্যার সৃষ্টি করে। চতুর্থ শতক এবং তার পরেও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এ নিয়ে বিতর্ক চলতে থাকে। বিষয়টি ছিল, ঈসার ব্যক্তিত্বে ঈশ্বরত্ব ও মনুষ্যত্বের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল? ৪৫১ খৃষ্টাব্দে ক্যালসিডন কাউন্সিলে এর যে মীমাংসা হয়েছিল তা ছিল এই যে, ঈসার ব্যক্তি সত্তায় দু'টি পূর্ণাঙ্গ প্রকৃতি একত্র হয়েছে। একটি ঐশ্বরিক প্রকৃতি এবং অন্যটি মানবিক প্রকৃতি। উভয়টি একত্রে সংযুক্ত হবার পরও কোন প্রকার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ছাড়াই প্রত্যেকের পৃথক বৈশিষ্ট অপরিবর্তিত রয়েছে। ৬৮০ খৃষ্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপলে অনুষ্ঠিত তৃতীয় কাউন্সিলে এর ওপর কেবল মাত্র এতটুকু বৃদ্ধি করা হয় যে, এ দু'টি প্রকৃতি নিজ নিজ পৃথক ইচ্ছারও অধিকারী। অর্থাৎ ঈসা একই সংগে দু'টি ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছার ধারক।....... এ অন্তরবর্তীকালে পশ্চিমী চার্চ 'গুনাহ' ও 'অনুগ্রহ' বিষয় দুটির প্রতিও বিশেষ নজর দেয়। 'নাজাত' বা 'মুক্তি'র ব্যাপারে আল্লাহর ভূমিকা কি এবং বান্দার ভূমিকা কি—এ প্রশ্নটি নিয়ে সেখানে দীর্ঘকাল আলোচনা চলতে থাকে। অবশেষে ৫২৯ খৃষ্টাব্দে উরিন্‌জের দ্বিতীয় কাউন্সিলে ...... এ মতবাদ গ্রহণ করা হয় যে, আদমের পৃথিবীতে নেমে আসার কারণে প্রত্যেকটি মানুষ এমন এক অবস্থার শিকার হয়েছে যার ফলে সে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করে নব জীবন ধারণ না করা পর্যন্ত নাজাত বা মুক্তির দিকে এক পাও অগ্রসর হতে পারে না। আর এ নব জীবন শুরু করার পরও যতক্ষণ না আল্লাহর অনুগ্রহ সার্বক্ষণিকভাবে তার সহায়ক থাকে ততক্ষণ সে সততা ও নেকীর অবস্থার মধ্যে টিকে থাকতে পারে না। আল্লাহর অনুগ্রহের এ সার্বক্ষণিক সাহায্য সে একমাত্র ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমেই লাভ করতে পারে।"

খৃষ্টীয় আলেমগণের এসব বর্ণনা থেকে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রথম দিকে যে জিনিসটি খৃষ্টীয় সমাজকে গোমরাহ করেছিল সেটি ছিল ভক্তি ও ভালবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি। এ বাড়াবাড়ির কারণে ঈসা আলাইহিস সালামের জন্য 'ঈশ্বর বা ইলাহ 'আল্লাহর

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَا
هَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ تَرَىٰ كَثِيرًا
مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ
أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿٨٠﴾

১১ রুকূ'

বনী ইসরাঈল জাতির মধ্য থেকে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে তাদের ওপর দাউদ ও মারয়াম পুত্র ঈসার মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হয়েছে। কারণ তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং বাড়াবাড়ি করতে শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল,[১০২] *তাদের গৃহীত সেই কর্মপদ্ধতি বড়ই জঘন্য ছিল। আজ তুমি তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক দেখছো যারা (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদের প্রতি সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে। নিসন্দেহে তাদের প্রবৃত্তি তাদেরকে যে পরিণতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট। সে পরিণতি হলো, আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং তারা চিরন্তন শাস্তি ভোগ করবে।*

পুত্র' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়। আল্লাহর গুণাবলী তাঁর সাথে সংযুক্ত করা হয় এবং তথাকথিত কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্ত সংক্রান্ত আকীদা উদ্ভাবন করা হয়। অথচ হযরত ঈসার শিক্ষাবলীতে এসব বিষয়ের কোন সামান্যতম অবকাশও ছিল না। তারপর খৃস্টবাদীদের গায়ে যখন দর্শনের বাতাস লাগলো তখন তারা এ প্রাথমিক গোমরাহী অনুধাবন করে তার খপ্পর থেকে বাঁচার চেষ্টা না করে উলটো নিজেদের পূর্ববর্তী নেতৃবৃন্দের ভুলগুলোকেই মেনে চলার জন্য সেগুলোর ব্যাখ্যা দিতে শুরু করলো এবং ঈসা আলাইহিস সালামের আসল শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ না করে নিছক দর্শন ও ন্যায়শাস্ত্রের সহায়তায় আকীদার পর আকীদা উদ্ভাবন করে চললো। খৃস্টবাদীদের এ গোমরাহীর বিরুদ্ধেই কুরআনের এ আয়াতগুলোতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

১০২. প্রত্যেক জাতির বিকৃতি শুরু হয় কয়েক ব্যক্তি থেকে। জাতির সামগ্রিক বিবেক জাগ্রত থাকলে সাধারণ জনমত ঐ বিপথগামী লোকদেরকে দমিয়ে রাখে এবং জাতি সামগ্রিকভাবে বিকৃতির হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু জাতি যদি ঐ ব্যক্তিগুলোর ব্যাপারে উপেক্ষা–অবহেলা ও উদাসীনতার নীতি অবলম্বন করে এবং দুষ্কৃতকারীদের তিরস্কার ও নিন্দা করার পরিবর্তে তাদেরকে সমাজে খারাপ কাজ করার জন্য স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়,

وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٨١﴾ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿٨٢﴾

যদি এ লোকেরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ, নবী এবং নবীর ওপর যা নাযিল হয়েছিল তা মেনে নিতো তাহলে কখনো (ঈমানদারদের মোকাবিলায়) কাফেরদেরকে নিজেদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতো না।[১০৩] কিন্তু তাদের অধিকাংশ আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করেছে।

ঈমানদারদের সাথে শত্রুতার ক্ষেত্রে তুমি ইহুদী ও মুশরিকদের পাবে সবচেয়ে বেশী উগ্র। আর ঈমানদারদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে নিকটতম পাবে তাদেরকে যারা বলেছিল আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী। এর কারণ হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইবাদাতকারী আলেম, সংসার বিরাগী দরবেশ পাওয়া যায়, আর তাদের মধ্যে আত্মগরিমা নেই।

তাহলে যে বিকৃতি প্রথমে কয়েক ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা ধীরে ধীরে সমগ্র জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বনী ইসরাঈল জাতির বিকৃতি এভাবেই হয়েছে।

হযরত দাউদ ও হযরত ঈসা বনী ইসরাঈলের ওপর যে অভিসম্পাত বা লানত করেছেন তা জানার জন্য দেখুন যবূর (গীত সংহিতা ১০ ও ৫০ এবং মথি ২৩।)

১০৩. এর অর্থ হচ্ছে, যারা আল্লাহ, নবী ও আসমানী কিতাবকে মেনে নেয় তারা স্বাভাবিকভাবে মুশরিকদের মোকাবিলায় এমন লোকদের প্রতি বেশী সহানুভূতিশীল হয়, যাদের সাথে ধর্মের ব্যাপারে বিরোধ থাকলেও তারা তাদেরই মতো আল্লাহ ও আল্লাহ প্রেরিত অহির ধারাবাহিকতা ও রিসালাতকে মানে। কিন্তু এ ইহুদীরা এক অদ্ভুত ধরনের আহ্‌লি কিতাব। তাওহীদ ও শিরকের যুদ্ধে এরা প্রকাশ্যে মুশরিকদের সাথে সহযোগিতা করছে। নবুওয়াতের স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির লড়াইয়ে এদের সহানুভূতি রয়েছে নবুওয়াত অস্বীকারকারীদের প্রতি। এরপরও এরা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে এ দাবী করে বেড়াচ্ছে যে, তারা নবী ও কিতাব মানে।

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ
مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ ۚ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ
الشَّاهِدِينَ (৮৩) وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ ۙ وَنَطْمَعُ أَنْ
يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ (৮৪) فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ (৮৫)
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (৮৬)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (৮৭) وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (৮৮)

যখন তারা এ কালাম শোনে, যা রসূলের ওপর নাযিল হয়েছে, তোমরা দেখতে পাও, সত্যকে চিনতে পারার কারণে তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে। তারা বলে ওঠে, "হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, সাক্ষদাতাদের মধ্যে আমাদের নাম লিখে নাও।" আর তারা আরো বলে, "আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান কেন আনবো না এবং যে সত্য আমাদের কাছে এসেছে তাকে কেন মেনে নেবো না—যখন আমরা এ ইচ্ছা পোষণ করে থাকি যে, আমাদের রব যেন আমাদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ লোকদের অন্তরভুক্ত করেন। তাদের এ উক্তির কারণে আল্লাহ তাদেরকে এমনসব জান্নাত দান করেছেন যার নিম্নদেশ দিয়ে ঝরণাধারা প্রবাহিত হয় এবং তারা সেখানে থাকবে চিরকালের জন্য। সৎ-কর্মনীতি অবলম্বনকারীদের জন্য এ প্রতিদান। আর যারা আমার আয়াত মানতে অস্বীকার করেছে ও সেগুলোকে মিথ্যা বলেছে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

১২ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য যেসব পবিত্র জিনিস হালাল করেছেন সেগুলো হারাম করে নিয়ো না।[১০৪] আর সীমালংঘন করো না।[১০৫] সীমা-লংঘনকারীদেরকে আল্লাহ ভীষণভাবে অপছন্দ করেন। আল্লাহ তোমাদের যে হালাল ও পবিত্র রিযিক দিয়েছেন তা থেকে পানাহার করো এবং সে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকো যার ওপর তোমরা ঈমান এনেছো।

১০৪. এ আয়াতে দু'টি কথা বলা হয়েছে। এক, তোমরা নিজেরাই কোন জিনিস হালাল ও হারাম গণ্য করার অধিকারী হয়ে বসো না। আল্লাহ যেটি হালাল করেছেন সেটি হালাল এবং আল্লাহ যেটি হারাম করেছেন সেটি হারাম। নিজেদের ক্ষমতা বলে তোমরা নিজেরা যদি কোন হালালকে হারাম করে ফেলো তাহলে আল্লাহর আইনের পরিবর্তে তোমরা নফসের ও প্রবৃত্তির আইনের অনুগত গণ্য হবে। দুই, খৃষ্টীয় সন্যাসী, হিন্দু যোগী, বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ইশরাকী তাসাউফ পন্থীদের মতো বৈরাগ্য, সংসার বিমুখতা ও দুনিয়ার বৈধ স্বাদ আস্বাদন পরিহার করার পদ্ধতি অবলম্বন করো না। ধর্মীয় মানসিকতার অধিকারী সৎস্বভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে সাধারণভাবে এ প্রবণতা দেখা গেছে যে, শরীর ও প্রবৃত্তির অধিকার আদায় ও চাহিদা পূরণ করাকে তারা আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় মনে করে থাকেন। তাদের ধারণা, নিজেকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপ করা, নিজের প্রবৃত্তিকে পার্থিব ভোগ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা এবং দুনিয়ার জীবন যাপনের বিভিন্ন উপায়–উপকরণের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা মূলত একটি মহৎ কাজ এবং এ ছাড়া আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যেতে পারে না। সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যেও কেউ কেউ এ মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, কোন কোন সাহাবী অংগীকার করেছেন ঃ তারা সর্বক্ষণ রোযা রাখবেন, রাতে বিছানায় ঘুমাবেন না বরং সারা রাত জেগে ইবাদাত করবেন, গোশ্‌ত, তেল, চর্বি, ঘি ইত্যাদি ব্যবহার করবেন না, নারীদের সাথে সম্পর্ক রাখবেন না। একথা শুনে তিনি একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন ঃ "আমাকে এ ধরনের কাজ করার হুকুম দেয়া হয়নি। তোমাদের প্রবৃত্তিরও তোমাদের ওপর অধিকার আছে। রোযা রাখো আবার পানাহারও করো। রাতে জেগে ইবাদাত করো আবার নিদ্রাও যাও। আমাকে দেখো। আমি ঘুমাই আবার রাত জেগে ইবাদাতও করি। রোযা রাখি আবার কখনো রাখিও না। গোশতও খাই আবার ঘিও খাই। কাজেই যে ব্যক্তি আমার রীতিনীতি পছন্দ করে না সে আমার অন্তরভুক্ত নয়।" তারপর আবার বললেন ঃ "লোকদের কি হয়ে গেছে, তারা নারী, ভাল খাবার, সুগন্ধি, নিদ্রা ও দুনিয়ার স্বার্দ আনন্দ নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়েছে? আমি তোমাদের পাদ্রী ও সংসারত্যাগী হয়ে যাবার শিক্ষা দেইনি। আমি যে দীনের প্রচলন করেছি তাতে নারী ও গোশ্‌ত থেকে দূরে থাকার কোন অবকাশ নেই এবং সেখানে সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যবাদী জীবন যাপনেরও কোন সুযোগ নেই আত্মসংযমের জন্য আমার এখানে আছে রোযা। সংসারত্যাগী জীবনের সমস্ত ফায়দা এখানে লাভ করা হয় জিহাদের মাধ্যমে। আল্লাহর বন্দেগী করো। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। হজ্জ ও উমরাহ করো। নামায কায়েম করো, যাকাত দাও ও রমযানের রোযা রাখো। তোমাদের আগে যারা ধ্বংস হয়েছে তারা এ জন্য ধ্বংস হয়েছে যে, তারা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করেছিল। আর যখন তারা নিজেরা নিজেদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলো তখন আল্লাহও তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ করলেন। তোমরা গীর্জায় ও খানকাহে যাদেরকে দেখছো এরা হচ্ছে তাদেরই অবশিষ্ট উত্তরসূরী।"

এ প্রসঙ্গে কোন কোন রেওয়ায়াত থেকে এতদূরও জানা যায় যে, একজন সাহাবীর ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানতে পারলেন, তিনি দীর্ঘদিন থেকে নিজের স্ত্রী সান্নিধ্যে যাচ্ছেন না এবং রাত দিন ইবাদাতে মশগুল থাকছেন। তিনি তাকে ডেকে হুকুম দিলেন, এখনি তোমার স্ত্রীর কাছে যাও। সাহাবী জবাব দিলেন, আমি রোযা

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۚ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۚ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿٨٩﴾

তোমরা যে সমস্ত অর্থহীন কসম খেয়ে ফেলো। সে সবের জন্য আল্লাহ তোমাদের পাকড়াও করেন না। কিন্তু তোমরা জেনে বুঝে যেসব কসম খাও সেগুলোর ওপর তিনি অবশ্যি তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। (এ ধরনের কসম ভেঙে ফেলার) কাফ্ফারা হচ্ছে, দশ জন মিসকিনকে এমন মধ্যম পর্যায়ের আহার দান করো যা তোমরা নিজেদের সন্তানদের খেতে দাও অথবা তাদেরকে কাপড় পরাও বা একটি গোলামকে মুক্ত করে দাও। আর যে ব্যক্তি এর সামর্থ রাখে না সে যেন তিন দিন রোযা রাখে। এ হচ্ছে তোমাদের কসমের কাফ্ফারা যখন তোমরা কসম খেয়ে তা ভেঙে ফেলো।[১০৬] তোমাদের কসমসমূহ সংরক্ষণ করো।[১০৭] এভাবে আল্লাহ নিজের বিধান তোমাদের জন্য সুস্পষ্ট করেন, হয়তো তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

রেখেছি। জবাব দিলেন, রোযা ভেঙ্গে ফেলো এবং স্ত্রীর কাছে যাও। হযরত উমরের আমলে জনৈকা মহিলা অভিযোগ করলেন, আমার স্বামী সারাদিন রোযা রাখেন, রাতে ইবাদাত করেন এবং আমার সাথে কোন সম্পর্ক রাখেন না। হযরত উমর (রা) তার মামলার নিষ্পত্তির জন্য প্রখ্যাত তাবেঈ বুযর্গ কা'ব ইবনে সাওরুল আযদিকে নিযুক্ত করলেন। তিনি ফায়সালা দিলেন, এ মহিলার স্বামী তিন রাত ইচ্ছামতো ইবাদাত করতে পারেন কিন্তু চতুর্থ রাতে অবশ্যি তার স্ত্রীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

১০৫. সীমালংঘন করার অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। হালালকে হারাম করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পাক-পবিত্র জিনিসগুলো থেকে এমনভাবে দূরে সরে থাকা যেন সেগুলো নাপাক, এটাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। তারপর পাক পবিত্র জিনিসগুলো অযথা ও অপ্রয়োজনে ব্যয় করা, অপচয় ও অপব্যয় করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী ও প্রচুর পরিমাণে ব্যয় করাও এক ধরনের বাড়াবাড়ি। আবার হালালের সীমা পেরিয়ে হারামের সীমানায় প্রবেশ করাও বাড়াবাড়ি। এ তিনটি কাজই আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয়।

১০৬. যেহেতু কোন কোন লোক হালাল জিনিসগুলো নিজেদের ওপর হারাম করে নেবার কসম খেয়েছিল তাই এ প্রসংগে আল্লাহ এ কসমের বিধানও বর্ণনা করে দিয়েছেন।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝

হে ঈমানদারগণ! এ মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরসমূহ[১০৮] এ সমস্তই হচ্ছে ঘৃণ্য শয়তানী কার্যকলাপ। এগুলো থেকে দূরে থাকো, আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।[১০৯]

সে বিধান হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ যদি কোন ব্যক্তির মুখ থেকে অনিচ্ছাকৃতভাবে কসম শব্দ বের হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তা পূর্ণ করার তেমন কোন প্রয়োজন নেই। কারণ এ ধরনের কসমের জন্য পাকড়াও করা হবে না। আর যদি কেউ জেনে বুঝে কসম খেয়ে থাকে........ সে যেন তা ভেঙে ফেলে এবং এ জন্য কাফ্‌ফারা আদায় করে। কারণ যে ব্যক্তি কোন গুনাহের কাজ করার কসম খেয়ে বসে তার নিজের কসম পূর্ণ করা উচিত নয়। (দেখুন, সূরা বাকারা, টীকা ২৪৩, ২৪৪। এ ছাড়া কাফ্‌ফারার ব্যাখ্যার জন্য দেখুন সূরা আন নিসা, টীকা ১২৫)

১০৭. কসম সংরক্ষণ করার কয়েকটি অর্থ হয়। এক, কসমকে সঠিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হবে। আজেবাজে অর্থহীন কথায় ও গুনাহের কাজে কসম খাওয়া যাবে না। দুই, কোন বিষয় কসম খেলে সেটা মনে রাখতে হবে, নিজের গাফলতির কারণে তা ভুলে গিয়ে তার বিরুদ্ধাচরণ করা যাবে না। তিন, কোন সঠিক বিষয়ে জেনে বুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে কসম খেলে তা অবশ্যি পূর্ণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধাচরণ করা হলে অবশ্যি কাফ্‌ফারা আদায় করতে হবে।

১০৮. মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শরের ব্যাখ্যার জন্য সূরা মায়েদার ১২ ও ১৪ টীকা দেখুন। এ প্রসংগে জুয়ার ব্যাখ্যাও ১৪ টীকায় পাওয়া যাবে। যদিও ভাগ্য নির্ণায়ক শর (আযলাম) স্বভাবতই এক ধরনের জুয়া তবুও তাদের উভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটি হচ্ছে, আরবী ভাষায় 'আযলাম' বলা হয় এমন ধরনের ফাল গ্রহণ ও শর নিক্ষেপ করাকে যার সাথে মুশরিকী আকীদা–বিশ্বাস ও কুসংস্কার জড়িত থাকে। আর 'মাইসির' (জুয়া) শব্দটি এমন সব খেলা ও কাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে আকস্মিক ঘটনাকে অর্থোপার্জন, ভাগ্য পরীক্ষা এবং অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী বন্টনের মাধ্যমে পরিণত করা হয়।

১০৯. এ আয়াতে চারটি জিনিস চূড়ান্তভাবে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এক, মদ। দুই, জুয়া। তিন, এমন সব জায়গা যেগুলোকে আল্লাহ ছাড়া আর কারোর ইবাদাত করার অথবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো জন্য কুরবানী করার ও নজরানা দেবার জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। চার, ভাগ্য নির্ণায়ক শর। শেষের তিনটির ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে। মদ সম্পর্কে বিস্তারিত বিধান নীচে দেয়া হলো ঃ

মদ হারাম হওয়া প্রসংগে ইতিপূর্বে আরো দু'টি নির্দেশ এসেছিল। সে দু'টি আলোচিত হয়েছে সূরা বাকারার ২১৯ আয়াতে এবং সূরা আন নিসার ৪৩ আয়াতে। এরপর এ তৃতীয় নির্দেশটি আসার আগে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এক ভাষণে লোকদেরকে

সতর্ক করে দিয়ে বলেন ঃ মহান আল্লাহ মদ অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মদ চিরতরে হারাম হয়ে যাবার নির্দেশ জারি হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কাজেই যাদের কাছে মদ আছে তাদের তা বিক্রি করে দেয়া উচিত। এর কিছুদিন পর এ আয়াত নাযিল হয়। এবার তিনি ঘোষণা করেন, এখন যাদের কাছে মদ আছে তারা তা পান করতে পারবে না এবং বিক্রিও করতে পারবে না বরং তা নষ্ট করে দিতে হবে। কাজেই তখনই মদীনার সমস্ত গলিতে মদ ঢেলে দেয়া হয়। অনেকে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো ফেলে না দিয়ে আমরা ইহুদীদেরকে তোহ্ফা হিসেবে দিই না কেন? জবাবে নবী করীম (স) বলেন, "যিনি একে হারাম করেছেন তিনি একে তোহফা হিসেবে দিতেও নিষেধ করেছেন।" কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেন, আমরা মদকে সিরকায় পরিবর্তিত করে দিই না কেন? তিনি এটিও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং নির্দেশ দেন ঃ "না, ওগুলো ঢেলে দাও।" এক ব্যক্তি অত্যন্ত জোর দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, ওষুধ হিসেবে ব্যবহারের নিশ্চয়ই অনুমতি আছে? জবাব দেন ঃ "না, এটা ওষুধ নয় বরং রোগ।" আর একজন আরয করেন, "হে আল্লাহর রসূল! আমরা এমন এক এলাকার অধিবাসী যেখানে শীত অত্যন্ত বেশী এবং আমাদের পরিশ্রমও অনেক বেশী করতে হয়। আমরা মদের সাহায্যে ক্লান্তি ও শীতের মোকাবিলা করি। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তোমরা যা পান করো তা কি নেশা সৃষ্টি করে? লোকটি ইতিবাচক জবাব দেন। তখন তিনি বলেন, তাহলে তা থেকে দূরে থাকো। লোকটি তবুও বলেন, কিন্তু এটা তো আমাদের এলাকার লোকেরা মানবে না। জবাব দেন, "তারা না মানলে তাদের সাথে যুদ্ধ করো।"

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) রেওয়ায়াত করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ

لَعَنَ اللّٰهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُوْلَةَ اِلَيْهِ -

"আল্লাহ লানত বর্ষণ করেছেন (১) মদের ওপর, (২) মদ পানকারীর ওপর, (৩) মদ পরিবেশনকারীর ওপর, (৪) মদ বিক্রেতার ওপর, (৫) মদ ক্রয়কারীর ওপর, (৬) মদ উৎপাদন ও শোধনকারীর ওপর, (৭) মদ উৎপাদন ও শোধনের ব্যবস্থাপকের ওপর, (৮) মদ বহনকারীর ওপর এবং (৯) মদ যার কাছে বহন করে নিয়ে যাওয়া হয় তার ওপর।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন দস্তরখানে আহার করতে নিষেধ করেছেন যেখানে মদ পান করা হচ্ছে। প্রথম দিকে তিনি যেসব পাত্রে মদ তৈরী ও পান করা হতো সেগুলোর ব্যবহারও নিষিদ্ধ করে দেন। পরে মদ হারাম হবার হুকুমটি পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে তিনি পাত্রগুলো ব্যবহার করার অনুমতি দেন।

'খাম্‌র' শব্দটি আরবীতে মূলত আংগুর থেকে তৈরী মদের জন্য ব্যবহৃত হতো পরোক্ষ অর্থে গম, যব, কিসমিস, খেজুর ও মধু থেকে উৎপাদিত মদকেও খামর বলা হতো। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর এ নির্দেশকে নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেকটি

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطٰنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾ وَأَطِيعُوا اللّٰهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلٰى رَسُولِنَا الْبَلٰغُ الْمُبِينُ ﴿٩٢﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَّاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَّأَحْسَنُوا ۗ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿٩٣﴾

শয়তান তো চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা–বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদের বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এসব থেকে বিরত থাকবে? আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলো এবং (নিষিদ্ধ কাজ থেকে) বিরত থাকো। কিন্তু যদি তোমরা আদেশ অমান্য করো, তাহলে জেনে রাখো, আমার রসূলের প্রতি শুধুমাত্র সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেবারই দায়িত্ব ছিল।

যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করছে, তারা পূর্বে যা কিছু পানাহার করেছিল সে জন্য তাদেরকে কোন জবাবদিহি করতে হবে না, তবে এ জন্য শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে অবশ্যি ভবিষ্যতে যেসব জিনিস হারাম করা হয়েছে সেগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে, ঈমানের ওপর অবিচল থাকতে হবে এবং ভাল কাজ করতে হবে তারপর যে যে জিনিস থেকে বিরত রাখা হয় তা থেকে তাদের বিরত থাকতে হবে এবং আল্লাহর যেসব হুকুম নাযিল হয় সেগুলো মেনে চলতে হবে। অতপর আল্লাহভীতি সহকারে সদাচরণ অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ সদাচারীদের ভালবাসেন।

জিনিসের ওপর ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন। তিনি হাদীসে স্পষ্ট বলেছেন ঃ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস মদ এবং প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ "যে কোন পানীয় নেশা সৃষ্টি করলে তা হারাম।।"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ
وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٩٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۚ
وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ
بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ
أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

১৩ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ এমন শিকারের মাধ্যমে তোমাদের কঠিন পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করবেন যা হবে একেবারে তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যে, তোমাদের মধ্য থেকে কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে, তা দেখার জন্য। কাজেই এ সতর্কবাণীর পর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালংঘন করলো তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। হে ঈমানদারগণ। ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না।[১১০] *আর তোমাদের কেউ যদি জেনে বুঝে এমনটি করে বসে, তাহলে যে প্রাণীটি সে মেরেছে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্য থেকে তারই সমপর্যায়ের একটি প্রাণী তাকে নযরানা দিতে হবে, যার ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি। আর এ নযরানা কাবা ঘরে পৌঁছাতে হবে। অথবা এ গুনাহের কাফ্ফারা হিসেবে কয়েক জন মিসকীনকে খাবার খাওয়াতে হবে। অথবা সে অনুপাতে রোযা রাখতে হবে,*[১১১] *যাতে সে নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে। পূর্বে যা কিছু হয়ে গেছে সেসব আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। কিন্তু এখন যদি কেউ সে কাজের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আল্লাহ তার বদলা নেবেন। আল্লাহ সবার ওপর বিজয়ী এবং তিনি বদ্‌লা নেবার ক্ষমতা রাখেন।*

তিনি আরো বলেন : وَاَنَا اَنْهٰى مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ "আর আমি প্রত্যেকটি নেশা সৃষ্টিকারী জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করছি।"

হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু জুমার খুতবায় মদের সংজ্ঞা এভাবে দেন ঃ اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ "মদ বলতে এমন সব জিনিসকে বুঝায় যা বুদ্ধিকে বিকৃত করে ফেলে।"

এ ছাড়াও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ মূলনীতি বর্ণনা করেছেন ঃ مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهُ فَقَلِيْلُهُ حَرَامٌ "যে জিনিসের বেশী পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে তার সামান্য পরিমাণও হারাম।" তিনি আরো বলেছেন ঃ

مَا اَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْأُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ

"যে জিনিসের বড় এক পাত্র পরিমাণ পান করলে নেশা হয় তার ক্ষুদ্র পরিমাণ পান করাও হারাম।"

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে মদ পানকারীর জন্য বিশেষ কোন শাস্তি নির্ধারিত ছিল না। যে ব্যক্তিকে এ অপরাধে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হতো তাকে কিল, থাপ্পড়, জুতা, লাথি, গিঁট বাঁধা প্যাকানো কাপড় ও খেজুরের ছড়া দিয়ে পিটানো হতো। রসূলের আমলে এ অপরাধে বড় জোর চল্লিশ ঘা মারা হতো। হযরত আবু বকরের (রা) আমলে ৪০ ঘা বেত্রাঘাত করা হতো। হযরত উমরের (রা) আমলেও শুরুতে ৪০ ঘা বেত মারা হতো। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন লোকেরা এ অপরাধ অনুষ্ঠান থেকে বিরত থাকছে না তখন তিনি সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শক্রমে এ অপরাধের দণ্ড হিসেবে ৮০টি বেত্রাঘাত নির্ধারণ করেন। ইমাম মালেক, ইমাম আবু হানীফা এবং একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেঈও এ শাস্তিকেই মদ পানের দণ্ড হিসেবে গণ্য করেছেন। কিন্তু ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল এবং অন্য একটি বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম শাফেঈ ৪০ বেত্রাঘাতকেই এর শাস্তি হিসেবে মেনে নিয়েছেন। হযরত আলীও (রা) এটিই পছন্দ করেছেন।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে মদের প্রতি নিষেধাজ্ঞার এ বিধানটিকে শক্তি প্রয়োগ করে প্রতিষ্ঠিত করা ইসলামী রাষ্ট্রের কর্তব্যের অন্তরভুক্ত। হযরত উমরের শাসনামলে বনী সাকীফের রুয়াইশিদ নামক এক ব্যক্তির একটি দোকান পুড়িয়ে দেয়া হয়। কারণ সে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ বিক্রি করতো। আর একবার হযরত উমরের হুকুমে পুরো একটি গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়া হয়। কারণ সেই গ্রামে গোপনে মদ উৎপাদন ও চোলাই করা হতো এবং মদ বেচাকেনার কারবারও সেখানে চলতো।

১১০. ইহরাম বাঁধা অবস্থায় নিজে শিকার করা বা অন্যকে শিকারে সাহায্য করা উভয়টিই নিষিদ্ধ। এ ছাড়াও ইহরাম বাঁধা (মুহরিম) ব্যক্তির জন্য কোন শিকার করে আনা হলে তাও তার জন্য খাওয়া জায়েয নয়। তবে কোন ব্যক্তি নিজে যদি নিজের জন্য শিকার করে থাকে এবং সেখান থেকে মুহরিমকে তোহফা হিসেবে কিছু দিয়ে দেয় তাহলে তা খাওয়ায় কোন ক্ষতি নেই। হিংস্র পশু এ বিধানের আওতার বাইরে। সাপ, বিচ্ছু, পাগলা কুকুর এবং মানুষের ক্ষতি করে এমন সব পশু ইহরাম অবস্থায় মারা যেতে পারে।

১১১. কোন্ ধরনের পশু হত্যা করলে কতজন মিসকীনকে খাওয়াতে হবে বা ক'টি রোযা রাখতে হবে, এর ফায়সালাও করবেন দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি।

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ۚ ذَٰلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾

তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তা খাওয়া হালাল করে দেয়া হয়েছে।[১১২] যেখানে তোমরা অবস্থান করবে সেখানে তা খেতে পারো এবং কাফেলার জন্য পাথেয় হিসেবে নিয়ে যেতেও পার। তবে যতক্ষণ তোমরা ইহরাম বাঁধা অবস্থায় থাকো ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলভাগের শিকার হারাম করে দেয়া হয়েছে। কাজেই আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো। তোমাদের সবাইকে ঘেরাও করে তাঁর সামনে হাযির করা হবে।

আল্লাহ পবিত্র কাবা ঘরকে মানুষের জন্য (সমাজ জীবন) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিণত করেছেন আর হারাম মাস, কুরবানীর পশু ও গলায় মালা পরা পশুগুলোকেও (এ কাজে সহায়ক বানিয়ে দিয়েছেন)[১১৩] যাতে তোমরা জানতে পারো যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত অবস্থা জানেন এবং তিনি সব জিনিসের জ্ঞান রাখেন।[১১৪]

১১২. যেহেতু সামুদ্রিক সফরে অনেক সময় পাথেয় শেষ হয়ে যায় এবং আহার সংগ্রহের জন্য জলজ প্রাণী শিকার করা ছাড়া আর কোন পথ থাকে না, তাই সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হয়েছে।

১১৩. আরবে কাবা ঘরের মর্যাদা কেবলমাত্র একটি ইবাদাতগৃহ হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত ছিল না বরং নিজের কেন্দ্রীয় অবস্থান ও পবিত্রতম ভাবমূর্তির কারণে এরই ওপর সারা দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনধারায় নির্ভরশীল ছিল। হজ্জ ও উমরাহর জন্য সারাদেশ কাবা ঘরের দিকে ধাবিত হতো। হজ্জ উপলক্ষে এ সম্মিলনের কারণে বিশৃংখল ও বিক্ষিপ্ত আরবদের মধ্যে একটি ঐক্য সূত্র সৃষ্টি হতো। বিভিন্ন অঞ্চল ও গোত্রের লোকেরা নিজদের মধ্যে তামাদ্দুনিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত করতো। কাব্য সম্মেলন ও কবিতা প্রতিযোগিতার ফলে তাদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হতো। বাণিজ্যিক লেনদেনের ফলে সারাদেশের অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূর্ণ হতো। হারাম মাসগুলোর কারণে আরবরা বছরের এক-তৃতীয়াংশ সময় লাভ করতো শান্তি ও নিরাপত্তার

اِعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ وَاَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ ﴿٩٩﴾ قُلْ لَّا يَسْتَوِى الْخَبِيْثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْثِ ۚ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٠﴾

জেনে রাখো, আল্লাহ শাস্তি দানের ব্যাপারে যেমন কঠোর তেমনি তিনি ক্ষমাশীল ও করুণাময়ও। রসূলের ওপর কেবলমাত্র বাণী পৌঁছিয়ে দেবার দায়িত্বই অর্পিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে তোমাদের প্রকাশ্য ও গোপন সমস্ত অবস্থাই আল্লাহ জানেন। হে নবী! এদেরকে বলে দাও, পবিত্র ও অপবিত্র সমান নয়, অপবিত্রের আধিক্য তোমাদের যতই চমৎকৃত করুক না কেন।[১১৫] কাজেই হে বুদ্ধিমানেরা! আল্লাহর নাফরমানী করা থেকে দূরে থাকো আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।

জন্য। এ সময় তাদের কাফেলা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অবাধে চলাফেরা করতো। কুরবানীর পশু ও বিচিত্র বর্ণের ঝলমলে মালা জড়ানো পশু দলের উপস্থিতিও তাদের এ চলাফেরায় বিরাট সাহায্য যোগাতো। কারণ মানত ও নযরানার আলামত হিসেবে যেসব পশুর গলায় ঝলমলে মালা শোভা পেতো তাদের দেখে ভক্তিতে আরবদের মাথা নত হয়ে আসতো। এ সময় কোন লুটেরা আরব গোত্র তাদের ওপর আক্রমণ চালাবার দুঃসাহস করতো না।

১১৪. অর্থাৎ এ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে চিন্তা করলে তোমরা নিজেরাই তোমাদের দেশের অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক জীবনে এর একটি সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যাবে যে, আল্লাহ তাঁর নিজের সৃষ্টির কল্যাণ ও প্রয়োজন সম্পর্কে কত গভীর জ্ঞানের অধিকারী এবং নিজের এক একটি বিধানের সাহায্যে তিনি মানব জীবনের বিভিন্ন বিভাগকে কত ব্যাপকভাবে উপকৃত করছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্বে অশান্তি ও অরাজকতার মধ্য দিয়ে যে শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে, সে সময় তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ ও প্রয়োজন সম্পর্কে অবগত ছিলে না। তখন তোমরা নিজেদের ধ্বংস সাধনের নেশায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রয়োজন জানতেন। তিনি শুধুমাত্র কাবাঘরকে তোমাদের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যার ফলে তোমাদের জাতীয় জীবন সুরক্ষিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যান্য অসংখ্য বিষয় বাদ দিয়ে যদি শুধুমাত্র এ একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করো তাহলে তোমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে যে, আল্লাহ তোমাদের যে বিধান দিয়েছেন তার আনুগত্য করার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। এর মধ্যে তোমাদের জন্য এমন সব কল্যাণ রয়েছে যেগুলো উপলব্ধি করার ক্ষমতা তোমাদের নেই এবং নিজেদের হাজারো চেষ্টা সাধনা দ্বারাও সেগুলোকে বাস্তবে রূপায়িত করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَسْـَٔلُوا۟ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ
وَإِن تَسْـَٔلُوا۟ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ
غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٠١﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا۟ بِهَا كَٰفِرِينَ ﴿١٠٢﴾
مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآئِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ
ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٠٣﴾

১৪ রুকূ'

হে ঈমানদারগণ! এমন কথা জিজ্ঞেস করো না যা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেয়া হলে তোমাদের খারাপ লাগবে।[১১৬] তবে কুরআন নাযিলের সময় যদি তোমরা সেসব বিষয়ে জিজ্ঞেস করো তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করা হবে। এ পর্যন্ত তোমরা যা কিছু করেছো, আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। তিনি ক্ষমাশীল ও সহনশীল। তোমাদের পূর্বে একটি দল এ ধরনের প্রশ্ন করেছিল। তারপর সেসব কথার জন্যই তারা কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিল।[১১৭]

আল্লাহ কোন 'বাহীরা', 'সায়েবা', 'অসীলা' বা হাম নির্ধারণ করেননি[১১৮] কিন্তু এ কাফেররা আল্লাহর ওপর মিথ্যা দোষারোপ করে এবং তাদের অধিকাংশই জ্ঞানহীন (কারণ তারা এ ধরনের কাল্পনিক বিষয় মেনে নিচ্ছে)।

১১৫. এ আয়াতটি মূল্যবোধ ও মূল্যমানের এমন একটি মানদণ্ড পেশ করে, যা স্থূলদর্শী মানুষের মানদণ্ড থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্থূলদর্শীর দৃষ্টিতে পাঁচ টাকার তুলনায় একশ টাকার দাম অবশ্যি অনেক বেশী। কারণ একদিকে পাঁচ টাকা আর একদিকে একশ টাকা। কিন্তু এ আয়াতটি বলছে, যদি আল্লাহর নাফরমানী করে একশ টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা নাপাক ও অপবিত্র। অন্যদিকে আল্লাহর হুকুম পালনের আওতায় যদি পাঁচ টাকা লাভ করা হয় তাহলে তা পাক ও পবিত্র। আর অপবিত্রের পরিমাণ যত বেশীই হোক না কেন তা কোন দিন পবিত্রের সমান হতে পারবে না। আবর্জনার একটি স্তূপের তুলনায় এক ফোঁটা আতরের মূল্য ও মর্যাদা অনেক বেশী। এক পুকুর ভর্তি পেশাবের চাইতে সামান্য পরিমাণের পাক পবিত্র পানির মূল্য বেশী। কাজেই একজন যথার্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অবশ্যি হালাল জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা উচিত, আপাত দৃষ্টিতে তার পরিমাণ যতই সামান্য হোক না কেন এবং হারামের দিকে কোন অবস্থাতেই হাত বাড়ানো উচিত নয়, বাহ্যত তা যতই বিপুল পরিমাণ ও যতই আড়ম্বরপূর্ণ হোক না কেন।

১১৬. কোন কোন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অদ্ভুত ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন করতো এ প্রশ্নগুলোর সাথে দীনের কোন প্রয়োজন জড়িত থাকতো না এবং দুনিয়ার কোন প্রয়োজনের সাথেও এর সম্পর্ক থাকতো না। যেমন একবার এক ব্যক্তি প্রকাশ্য জন–সমাবেশে তাঁকে জিজ্ঞেস করলো, "আমার আসল পিতা কে?" এমনিভাবে অনেক লোক শরীয়াতের বিধানের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করতো এবং এভাবে অনর্থক জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন সব বিষয় নির্ধারণ করতে চাইতো যা প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ও সংগত কারণেই শরীয়াতের বিধানদাতা নিজেই অনির্ধারিত রেখে দিয়েছেন। যেমন কুরআনে সংক্ষেপে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্জ তোমাদের ওপর ফরয করা হয়েছে। এক ব্যক্তি এ নির্দেশ শোনার সাথে সাথেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, "এ কি প্রত্যেক বছরে ফরয করা হয়েছে? তিনি এর কোন জবাব দিলেন না? ঐ ব্যক্তি আবার জিজ্ঞেস করলো। তিনি এবারও চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বার জিজ্ঞেস করার পর তিনি বললেন ঃ "তোমার প্রতি আফসোস, আমার মুখ থেকে হাঁ শব্দ বের হয়ে গেলে তোমাদের জন্য প্রতি বছর হজ্জ করা ফরয হয়ে যাবে। তখন তোমরাই তা মেনে চলতে পারবে না, ফলে নাফরমানি করতে থাকবে।" এ ধরনের সমস্ত অর্থহীন ও অবান্তর প্রশ্ন করা থেকে এ আয়াতে নিষেধ করা হয়েছে।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও লোকদেরকে বেশী বেশী প্রশ্ন করতে ও অনর্থক প্রত্যেকটি ব্যাপারের গভীরে প্রবেশ করে ঘাটাঘাটি করতে নিষেধ করতেন। এ প্রসংগে হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اَعْظَمَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَئٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَى النَّاسِ فَحُرِّمَ مِنْ اَجْلِ مَسْأَلَتِهِ –

"মুসলমানদের কাছে সবচেয়ে বড় অপরাধী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে এমন একটি জিনিস সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যা লোকদের জন্য হারাম ছিল না, অথচ নিছক তার প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাবাদের কারণে সে জিনিসটি হারাম গণ্য করা হলো।"

অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلاَ تُضَيِّعُوْهَا وَحَرَّمَ حُرُمَاتٍ فَلاَ تَنْتَهِكُوْهَا وَحَدَّ حُدُوْدًا فَلاَ تَعْتَدُوْهَا وَسَكَتَ عَنْ اَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلاَ تَبْحَثُوْا عَنْهَا

"আল্লাহ তোমাদের ওপর কিছু কাজ ফরয করে দিয়েছেন, সেগুলো ত্যাগ করো না। কিছু জিনিস হারাম করে দিয়েছেন, সেগুলোর ধারে কাছে ঘেঁষো না। কিছু সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেগুলো লংঘন করো না। আবার কিছু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন কিন্তু তা ভুলে যাননি, কাজেই সেগুলোর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ো না।"

এ হাদীস দু'টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছে। শরীয়াতের বিধানদাতা যেসব বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেননি

অথবা যে বিধানগুলো সংক্ষেপে দিয়েছেন এবং যেগুলোর পরিমাণ, সংখ্যা বা অন্যান্য বিষয় উল্লেখ করেননি, সেগুলো সংক্ষেপে বা অবিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার কারণ এ নয় যে, বিধানদাতা সেগুলো বর্ণনা করতে ভুলে গিয়েছেন এবং বিস্তারিত বর্ণনা করার প্রয়োজন ছিল কিন্তু তা করেননি বরং এর আসল কারণ হচ্ছে এই যে, বিধানদাতা এ বিষয়গুলোর বিস্তারিত রূপ সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ করতে চান না এবং এ বিধানগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য প্রশস্ততা ও ব্যাপকতা রাখতে চান। এখন যে ব্যক্তি কোন বিষয়ে অযথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন উত্থাপন করে তার বিস্তারিত রূপ, নির্দিষ্ট বিষয়াবলী ও সীমাবদ্ধতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে এবং বিধানদাতার বক্তব্য থেকে যদি বিষয়গুলো কোনক্রমে প্রকাশিত না হয়, তাহলে আন্দাজ–অনুমান করে কল্পনা ও উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে কোন না কোন প্রকারে সংক্ষিপ্ত বিষয়কে বিস্তারিত, ব্যাপককে সীমাবদ্ধ এবং অনির্দিষ্টকে নির্দিষ্ট করেই ক্ষান্ত হয়, তবে সে আসলে মুসলমানদের বিরাট বিপদের মুখে ঠেলে দেয়। কারণ অতিপ্রাকৃতিক বিষয়সমূহ যত বেশী বিস্তারিত আকারে সামনে আসবে ইমানদারদের জন্য জটিলতা তত বেশী বেড়ে যাবে। আর আল্লাহর নির্দেশ ও বিধানের সাথে যত বেশী শর্ত জড়িত হবে এবং এগুলোকে যত বেশী সীমাবদ্ধ করে দেয়া হবে আনুগত্যকারীদের জন্য নির্দেশ অমান্য করার সম্ভাবনা তত বেশী দেখা দেবে।

১১৭. অর্থাৎ প্রথমে তারা নিজেরাই আকীদা বিশ্বাস ও বিধি বিধানের অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এবং এক একটি বিষয় সম্পর্কে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে নিজেদের জন্য বিস্তারিত অবয়ব ও শর্তাবলীর একটি জাল তৈরী করে। তারপর নিজেরাই সেই জালে জড়িত হয়ে আকীদাগত গোমরাহী ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। একটি দল বলতে এখানে ইহুদীদের কথা বুঝানো হয়েছে। কুরআন ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্ক বাণী সত্ত্বেও মুসলমানরা তাদের পদাংক অনুসরণ করে চলার ব্যাপারে যে কোন প্রকার প্রচেষ্টা চালাতে কসূর করেনি।

১১৮. আমাদের দেশে যেমন গরু, ষাঁড় ও ছাগল আল্লাহর বা ভগবানের নামে অথবা কোন দেবদেবী, ঠাকুর, বা পীর–আউলিয়ার নামে ছেড়ে দেয়া হয়, তাদেরকে ভারবহন বা অন্য কোন কাজে লাগানো হয় না এবং তাদেরকে যবেহ করা বা তাদের সাহায্যে কোন প্রকার ফায়দা হাসিল করা হারাম মনে করা হয়, ঠিক তেমনি জাহেলী যুগে আরববাসীরাও পুণ্য কাজের নিদর্শন হিসেবে বিভিন্ন পশু ছেড়ে দিতো। এ ধরনের ছেড়ে দেয়া পশুদের আলাদা আলাদা নামে আখ্যায়িত করা হতো। যেমন ঃ

বাহীরা ঃ এমন ধরনের উষ্ট্রীকে বলা হতো, যে পাঁচবার শাবক প্রসব করেছে এবং শেষবারের শাবকটি হয়েছে 'নর'। এ উষ্ট্রীর কান চিরে দিয়ে তাকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে ছেড়ে দেয়া হতো। অতপর কেউ কখনো তাকে বাহন হিসেবে ব্যবহার করতো না। কেউ তার দুধও পান করতো না। কেউ তাকে যবেহও করতো না। এমনকি তার গায়ের পশমও কেউ কাটতো না। সে ইচ্ছেমতো যে কোন ক্ষেতে চরে বেড়াতো, যে কোন চারণভূমিতে ঘাস খেতো এবং যে কোন ঘাটে গিয়ে পানি পান করতো।

সায়েবা ঃ এমন উট বা উষ্ট্রীকে বলা হয়, যাকে কোন মানত পুরো হবার, কোন রোগ থেকে মুক্তি লাভ করার অথবা কোন বিপদ থেকে উদ্ধার লাভ করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের নিদর্শন স্বরূপ স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো। তাছাড়া সায়েবা এমন উটনীকেও

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

আর যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো সেই বিধানের দিকে যা আল্লাহ নাযিল করেছেন এবং এসো রসূলের দিকে, তখন তারা জবাব দেয়, আমাদের বাপ–দাদাকে যে পথে পেয়েছি সে পথই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তারা কি নিজেদের বাপ–দাদারই অনুসরণ করে চলবে, যদিও তারা কিছুই জানতো না এবং সঠিক পথও তাদের জানা ছিল না?

হে ঈমানদারগণ। নিজেদের কথা চিন্তা করো, অন্য কারোর গোমরাহীতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা নিজেরা সত্য সঠিক পথে থাকো।[১১৯] তোমাদের সবাইকে আল্লাহর দিকে ফিরে যেতে হবে। তখন তোমরা কি করছিলে তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।

বলা হতো, যে দশবার বাচ্চা প্রসব করেছে এবং প্রত্যেকটি বাচ্চা হয়েছে স্ত্রী জাতীয়। তাকেও স্বাধীনভাবে ছেড়ে দেয়া হতো।

অসীলা ঃ ছাগলের প্রথম বাচ্চাটা 'পাঁঠা' হলে তাকে উপাস্য দেবতাদের নামে যবেহ করে দেয়া হতো। আর যদি প্রথম বাচ্চাটা হতো 'পাঁঠী' তাহলে তাকে নিজের জন্য রেখে দেয়া হতো। কিন্তু একই সঙ্গে যদি পাঁঠা ও পাঁঠী বাচ্চা হতো তাহলে পাঁঠাটিকে যবেহ না করে দেবতাদের নামে ছেড়ে দেয়া হতো এবং তাকে বলা হতো অসীলা।

হাম ঃ কোন উটের পৌত্র যদি সওয়ারী বহন করার যোগ্যতা অর্জন করতো তাহলে বুড়ো উটটিকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হতো। তাছাড়া কোন উটের ঔরসে দশটি সন্তান জন্ম নেবার পর তাকেও স্বাধীন করে দেয়া হতো।

১১৯. অর্থাৎ অমুক কি করছে, অমুকের আকীদার মধ্যে কি গলদ আছে এবং অমুকের কাজে কোন্ কোন্ ধরনের দোষ–ত্রুটি আছে, সবসময় এসব দেখার পরিবর্তে মানুষের

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ شَهَٰدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ
ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ
فِى ٱلْأَرْضِ فَأَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنۢ بَعْدِ
ٱلصَّلَوٰةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِۦ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ
وَلَا نَكْتُمُ شَهَٰدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلْـَٔاثِمِينَ ﴿١٠٦﴾

হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কারোর মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় এবং সে অসিয়ত করতে থাকে তখন তার জন্য সাক্ষ নির্ধারণ করার নিয়ম হচ্ছে এই যে, তোমাদের সমাজ থেকে দু'জন ন্যায়নিষ্ঠ[১২০] ব্যক্তিকে সাক্ষী করতে হবে। অথবা যদি তোমরা সফরের অবস্থায় থাকো এবং সেখানে তোমাদের ওপর মৃত্যু রূপ বিপদ উপস্থিত হয় তাহলে দু'জন অমুসলিমকেই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করে নেবে।[১২১] তারপর কোন সন্দেহ দেখা দিলে নামাযের পরে উভয় সাক্ষীকে (মসজিদে) অপেক্ষমান রাখবে এবং তারা আল্লাহর কসম খেয়ে বলবে ঃ "আমরা কোন ব্যক্তি স্বার্থের বিনিময়ে সাক্ষ বিক্রি করবো না, সে কোন আত্মীয় হলেও (আমরা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করবো না) এবং আল্লাহর ওয়াস্তের সাক্ষকে আমরা গোপনও করবো না। এমনটি করলে আমরা গুনাহগারদের অন্তরভুক্ত হবো।"

দেখা উচিত, সে নিজে কি করছে। তার নিজের চিন্তাধারার এবং নিজের চরিত্র ও কার্যাবলীর কথা চিন্তা করা উচিত সেগুলো যেন খারাপ ও বরবাদ না হয়ে যায়। কোন ব্যক্তি নিজে যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে থাকে, তার ওপর আল্লাহ ও বান্দার যেসব অধিকার আরোপিত হয় সেগুলো আদায় করতে থাকে এবং সততা ও সঠিক পথ অবলম্বন করার দাবী পূর্ণ করে যেতে থাকে এবং এই সংগে সৎকাজের আদেশ করা ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখা তার কর্মসূচীর অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হতে থাকে, তাহলে নিশ্চিতভাবে অন্য কোন ব্যক্তির গোমরাহী ও বক্র পথে চলা তার জন্য কোন ক্ষতির কারণ হতে পারে না।

তাই বলে মানুষ কেবলমাত্র নিজের নাজাত ও মুক্তির কথা ভাববে, অন্যের সংশোধন করার কথা ভাববে না, এটা নিশ্চয়ই এ আয়াতের উদ্দেশ্য নয়। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে এক ভাষণে বলেন ঃ "হে লোকেরা।

فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا فَـَٔاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ
ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَـٰنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَـٰدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَـٰدَتِهِمَا
وَمَا ٱعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ﴿١٠٧﴾ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَن يَأْتُوا۟ بِٱلشَّهَـٰدَةِ
عَلَىٰ وَجْهِهَآ أَوْ يَخَافُوٓا۟ أَن تُرَدَّ أَيْمَـٰنٌۢ بَعْدَ أَيْمَـٰنِهِمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱسْمَعُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَـٰسِقِينَ ﴿١٠٨﴾

কিন্তু যদি একথা জানা যায় যে, তারা দু'জন নিজেদেরকে গোনাহে লিপ্ত করেছে, তাহলে যাদের স্বার্থহানি ঘটেছে তাদের মধ্য থেকে সাক্ষ দেবার ব্যাপারে আরো বেশী যোগ্যতা সম্পন্ন দু'জন লোক তাদের স্থলবর্তী হবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে "আমাদের সাক্ষ তাদের সাক্ষের চাইতে আরো বেশী ন্যায়নিষ্ঠ এবং নিজেদের সাক্ষের ব্যাপারে আমরা কোন বাড়াবাড়ি করিনি। এমনটি করলে আমরা জালেমদের অন্তরভুক্ত হবো।" এ পদ্ধতিতে বেশী আশা করা যায়, লোকেরা সঠিক সাক্ষ দেবে অথবা কমপক্ষে এতটুকু ভয় করবে যে, তাদের কসমের পর অন্য কসমের সাহায্যে তাদের বক্তব্য খণ্ডন করা হতে পারে। আল্লাহকে ভয় করো এবং শোনো। আল্লাহ নাফরমানদেরকে তাঁর পথনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত করেন।

তোমরা এ আয়াতটি পড়ে থাকো এবং এর ভুল ব্যাখ্যা করে থাকো। আমি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি, যখন লোকদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, তারা অসৎকাজ দেখবে কিন্তু তা পরিবর্তন করার চেষ্টা করবে না, জালেমকে জুলুম করতে দেখবে কিন্তু তার হাত টেনে ধরবে না তখন অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ তাঁর আযাব সকলের ওপর চাপিয়ে দেবেন। আল্লাহর কসম! তোমরা লোকদেরকে ভাল কাজ করার হুকুম দাও এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখো, নয়তো আল্লাহ তোমাদের ওপর এমন সব লোককে চাপিয়ে দেবেন যারা তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ এবং তারা তোমাদেরকে ভীষণ কষ্ট দেবে। তখন তোমাদের সৎলোকেরা আল্লাহর কাছে দোয়া করবে কিন্তু তা কবুল হবে না।

১২০. অর্থাৎ দীনদার, সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য।

১২১. এ থেকে জানা যায়, মুসলমানদের ব্যাপারে অমুসলিমদেরকে কেবলমাত্র তখনই সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে যখন কোন মুসলমান সাক্ষী পাওয়া যায় না।

يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُوْلُ مَاذَآ اُجِبْتُمْ ؕ قَالُوْا لَا عِلْمَ لَنَا ؕ اِنَّكَ
اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوْبِ ﴿١٠٩﴾ اِذْ قَالَ اللّٰهُ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِيْ
عَلَيْكَ وَعَلٰى وَالِدَتِكَ ۘ اِذْ اَيَّدْتُّكَ بِرُوْحِ الْقُدُسِ ۟ تُكَلِّمُ النَّاسَ
فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا ۚ وَاِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرٰىةَ
وَالْاِنْجِيْلَ ۚ وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّيْنِ كَهَيْـَٔةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِيْ فَتَنْفُخُ فِيْهَا
فَتَكُوْنُ طَيْرًا بِاِذْنِيْ وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ بِاِذْنِيْ ۚ

১৫ রুকূ'

যেদিন[১২২] আল্লাহ সমস্ত রসূলকে একত্র করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমাদের কী জবাব দেয়া হয়েছে?[১২৩] তারা আরয করবে, আমরা কিছুই জানিনা,[১২৪] গোপন সত্যসমূহের জ্ঞান একমাত্র আপনারই আছে। তারপর সে সময়ের কথা চিন্তা করো যখন আল্লাহ বলবেন,[১২৫] "হে মারয়ামের পুত্র ঈসা! আমার সে নিয়ামতের কথা স্মরণ করো, যা আমি তোমাকে ও তোমার মাকে দিয়েছিলাম। আমি পাক–পবিত্র রূহের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছিলাম। তুমি দোলনায় থেকেও লোকদের সাথে কথা বলেছিলে এবং পরিণত বয়সে পৌঁছেও। আমি তোমাকে কিতাব ও হিকমত এবং তাওরাত ও ইনজীলের শিক্ষা দিয়েছিলাম। তুমি আমার হুকুমে পাখির আকৃতির মাটির পুতুল তৈরী করে তাতে ফুঁক দিতে এবং আমার হুকুমে তা পাখি হয়ে যেতো। তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীকে আমার হুকুমে নিরাময় করে দিতে।

১২২. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন।

১২৩. অর্থাৎ দুনিয়াবাসীকে তোমরা যে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলে তারা তার কী জবাব দিয়েছে?

১২৪. অর্থাৎ আমাদের জীবনে আমরা যে সীমাবদ্ধ বাহ্যিক জবাবটুকু পেয়েছি বলে অনুভব করেছি কেবলমাত্র সেটুকুই আমরা জানি। আর আসলে আমাদের দাওয়াতের কোথায় কি প্রতিক্রিয়া হয়েছে এবং কোন্ আকৃতিতে তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তার সঠিক ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র আপনার ছাড়া আর কারোর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নয়।

১২৫. প্রথম প্রশ্নটি সকল রসূলকে সামগ্রিকভাবে করা হবে। তারপর প্রত্যেক রসূলের কাছ থেকে পৃথক পৃথকভাবে সাক্ষ নেয়া হবে। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথাটি

وَاِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتٰى بِاِذْنِىْ ۚ وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿١١٠﴾ وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيّٖنَ اَنْ اٰمِنُوْا بِىْ وَبِرَسُوْلِىْ ۚ قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَاشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ ﴿١١١﴾ اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ يٰعِيْسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيْعُ رَبُّكَ اَنْ يُّنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١١٢﴾

এবং মৃতদেরকে আমার হুকুমে বের করে আনতে।[১২৬] তারপর যখন তুমি সুস্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে বনী ইসরাঈলের কাছে পৌঁছলে এবং তাদের মধ্যে যারা সত্য অস্বীকারকারী ছিল তারা বললো, এ নিশানীগুলো যাদু ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন আমিই তোমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলাম। আর যখন আমি হাওয়ারীদেরকে ইংগিত করেছিলাম, আমার ও আমার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, তারা বলেছিল, আমরা ঈমান আনলাম এবং সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম।"[১২৭] — (হাওয়ারীদের[১২৮] প্রসংগে) এ ঘটনাটিও যেন মনে থাকে, যখন হাওয়ারীরা বলেছিল, হে মারয়াম পুত্র ঈসা! আপনার রব কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে একটি খাবার পরিপূর্ণ খাঞ্চা নাযিল করতে পারেন? ঈসা বলেছিল, আল্লাহকে ভয় করো, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাকো।

সুস্পষ্ট ভাষায় উল্লেখিত হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে যে প্রশ্ন করা হবে তা এখানে বিশেষভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

১২৬. অর্থাৎ মৃত্যুর অবস্থা থেকে বের করে জীবনের অবস্থায় আনতেন।

১২৭. অর্থাৎ হাওয়ারীদের তোমার প্রতি ঈমান আনাও ছিল আমার অনুগ্রহ ও সুযোগ দানেরই ফল। নয়তো যে জনবসতি তোমার দাওয়াতকে মিথ্যা বলে ঘোষণা দিয়েছিল সেখান থেকে নিজের শক্তির জোরে তোমাকে সত্য বলে স্বীকার করে, এমন একজন লোক বের করে আনার ক্ষমতাও তোমার ছিল না। প্রসংগত এখানে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, হাওয়ারীদের আসল ধর্ম ছিল ইসলাম, খৃস্টবাদ নয়।

১২৮. হাওয়ারীদের কথা আগে বলা হয়েছিল তাই এখানে এ আলোচনা প্রসংগের মধ্যেই হাওয়ারীদের সম্পর্কে আর একটি ঘটনার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ থেকে

قَالُوا نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿١١٣﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِّنكَ ۖ وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١٤﴾ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿١١٥﴾

তারা বলেছিল, আমরা কেবল এতটুকুই চাই যে, আমরা সেই খাঞ্চা থেকে খাবার খাবো, আমাদের মন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে এবং আমরা জেনে নেবো যে, আপনি যা কিছু বলেছেন তা সবই সত্য এবং আমরা তার সাক্ষী হয়ে যাবো। এ কথায় ঈসা ইবনে মারয়াম দোয়া করেছিল, "হে আল্লাহ! হে আমাদের রব! আমাদের ওপর আকাশ থেকে একটি খাদ্য ভরা খাঞ্চা নাযিল করো, যা আমাদের জন্য এবং আমাদের আগের–পিছের সবার জন্য আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে গণ্য হবে এবং তোমার পক্ষ থেকে হবে একটি নিদর্শন। আমাদের জীবিকা দান করো এবং তুমি সর্বোত্তম জীবিকা দানকারী।" আল্লাহ জবাব দিয়েছিলেন, "আমি তা তোমাদের ওপর নাযিল করবো।[১২৯] কিন্তু এরপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি কুফরী করবে তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যা দুনিয়ায় আর কাউকে দেইনি।"

একথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয় যে, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের যেসব শাগরিদ তাঁর কাছ থেকে সরাসরি দীক্ষা লাভ করেছিলেন তারা হযরত মসীহ্কে একজন মানুষ এবং নিছক আল্লাহর একজন বান্দা মনে করতেন। তাদের পরিচালক ও পথপ্রদর্শক যে আল্লাহ বা আল্লাহর সাথে শরীক অথবা আল্লাহর পুত্র–এই ধরনের কোন কথা মনে করা তাদের চিন্তা ও কল্পনার বাইরে ছিল। তাছাড়া হযরত মসীহ নিজেও তাদের সামনে নিজেকে একজন অক্ষম বান্দা হিসেবে পেশ করেছিলেন।

এখানে প্রশ্ন করা যেতে পারে, কিয়ামতের দিনে যে কথাবার্তা হবে সেখানে এ প্রাসংগিক বক্তব্যটির স্থান কোথায়? এর জবাবে বলা যায়, কিয়ামতের দিনে যে কথাবার্তা হবে তার সাথে এ প্রাসংগিক বক্তব্যের সম্পর্ক নেই। বরং এর সম্পর্ক হচ্ছে দুনিয়ায় আগামভাবে যেসব কথাবার্তা হচ্ছে তার সাথে। কিয়ামতের দিনে যেসব কথাবার্তা হবে এখানে তার আলোচনা করার উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বর্তমান জীবনে খৃষ্টানরা যেন তা থেকে

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يٰعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحٰنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ۚ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ۚ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿١١٦﴾ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١١٧﴾

১৬ রুকূ'

(মোটকথা এসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে) আল্লাহ যখন বলবেন, "হে মারয়াম পুত্র ঈসা! তুমি কি লোকদের বলেছিলে, আল্লাহকে বাদ দিয়ে আমাকে ও আমার মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করো?"[১৩০] তখন সে জবাব দেবে, "সুবহানাল্লাহ! যে কথা বলার কোন অধিকার আমার ছিল না সে ধরনের কোন কথা বলা আমার জন্য ছিল অশোভন ও অসংগত। যদি আমি এমন কথা বলতাম তাহলে আপনি নিশ্চয়ই তা জানতে পারতেন, আমার মনে যা আছে আপনি জানেন কিন্তু আপনার মনে যা আছে আমি তা জানি না, আপনি তো সমস্ত গোপন সত্যের জ্ঞান রাখেন। আপনি যা হুকুম দিয়েছিলেন তার বাইরে আমি তাদেরকে আর কিছুই বলিনি। তা হচ্ছে ঃ আল্লাহর বন্দেগী করো যিনি আমারও রব এবং তোমাদেরও। আমি যতক্ষণ তাদের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ আমি ছিলাম তাদের তদারককারী ও সংরক্ষক। যখন আপনি আমাকে ফিরিয়ে নিয়েছেন তখন আপনিই ছিলেন তাদের তত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক। আর আপনি তো সমস্ত জিনিসের তত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক।

শিক্ষা গ্রহণ করে এবং সত্য–সঠিক পথ অবলম্বন করে। কাজেই এ কথাবার্তার মাঝখানে একটি প্রাসংগিক বক্তব্য হিসেবে হাওয়ারীদের ঘটনাটির উল্লেখ মোটেই অবান্তর নয়।

১২৯. খাদ্য সম্ভার পরিপূর্ণ এ খাঞ্চা বাস্তবে নাযিল করা হয়েছিল কিনা, এ ব্যাপারে কুরআন মজীদ নীরব। অন্য কোন নির্ভরযোগ্য উপায়েও এ প্রশ্নটির জবাব পাওয়া যায় না।

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١١٨﴾ قَالَ اللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١٩﴾ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٢٠﴾

এখন যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন তাহলে তারা তো আপনার বান্দা আর যদি মাফ করে দেন তাহলে আপনি পরাক্রমশালী ও জ্ঞানময়।" তখন আল্লাহ বলবেন, "এটি এমন একটি দিন যেদিন সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যতা উপকৃত করে। তাদের জন্য রয়েছে এমন বাগান যার নিম্নদেশে ঝরণাধারা প্রবাহিত হচ্ছে। এখানে তারা থাকবে চিরকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি। এটিই সবচেয়ে বড় সাফল্য।"

পৃথিবী, আকাশসমূহ ও সমগ্র জাতির ওপর রাজত্ব আল্লাহরই জন্য নির্ধারিত এবং তিনি সবকিছুর ওপর শক্তিশালী।

হয়তো এটা নাযিল হয়েছিল। আবার হয়তো এমনও হতে পারে যে, পরবর্তী পর্যায়ে মারাত্মক ধরনের হুমকিটি শুনে হাওয়ারীগণ নিজেদের আবেদন প্রত্যাহার করেছেন।

১৩০. খৃস্টানরা আল্লাহর সাথে কেবলমাত্র ঈসা ও রূহুল কুদুস তথা পবিত্র আত্মাকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয়নি। এ সংগে তারা ঈসার মাতা হযরত মারয়ামকেও (আ) এক স্বতন্ত্র ইলাহে পরিণত করেছে। হযরত মারয়ামের ইলাহ হবার বা তার দেবত্ব বা অতিমানবিকতা সম্পর্কিত কোন ইংগিতও বাইবেলে নেই। হযরত ঈসার (আ) পরে প্রথম তিনশ বছর পর্যন্ত খৃস্টবাদী জগত এ ধারণার সাথে সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত ছিল। খৃস্টীয় তৃতীয় শতকের শেষের দিকে ইসকানদারিয়ার কিছু খৃস্টান পণ্ডিত হযরত মারয়ামের জন্য সর্বপ্রথম 'উম্মুল্লাহ' বা 'আল্লাহর মাতা' শব্দ ব্যবহার করেন। এরপর ধীরে ধীরে মারয়ামের ইলাহ হবার আকীদা এবং মারয়াম বন্দনা ও মারয়াম পূজার পদ্ধতি খৃস্টানদের মধ্যে প্রচলিত হতে থাকে। কিন্তু প্রথম প্রথম চার্চ এটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মেনে নিতে প্রস্তুত হয়নি। বরং মারয়াম পূজারীদেরকে ভ্রান্ত আকীদা সম্পন্ন বলে অভিহিত করতো। তারপর যখন মসীহের একক সত্তার মধ্যে দু'টি স্বতন্ত্র ও পৃথক সত্তার সমাবেশ ঘটেছে এ মর্মে প্রচারিত নাসতুরিয়াসের আকীদা নিয়ে সমগ্র খৃস্টীয় জগতে বিতর্ক ও আলোচনা–সমালোচনার ঝড় উঠলো। তখন এর মীমাংসা করার জন্য ৪৩১ খৃস্টাব্দে

আফসোস নগরে একটি কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হলো। এ কাউন্সিলে সর্বপ্রথম গীর্জার সরকারী ভাষায় হযরত মারয়ামের জন্য 'আল্লাহর মাতা' শব্দ ব্যবহার করা হলো। এর ফলে এতদিন মারয়াম পূজার যে রোগ গীর্জার বাইরে প্রসার লাভ করছিল এখন তা গীর্জার মধ্যেও দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। এমন কি কুরআন নাযিলের যুগে পৌঁছতে পৌঁছতে হযরত মারয়াম এত বড় দেবীতে পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন যার ফলে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা তিনজনই তার সামনে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিলেন। চার্চের বিভিন্ন স্থানে তাঁর মূর্তি স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। তার সামনে ইবাদাতের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করা হতো। তার কাছে প্রার্থনা করা হতো। তিনিই ছিলেন ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অভাব ও প্রয়োজন পূর্ণকারী, সংকট থেকে উদ্ধারকারী এবং অসহায়ের সহায় ও পৃষ্ঠপোষক। একজন নিষ্ঠাবান খৃস্ট বিশ্বাসীর জন্য সবচেয়ে বড় ভরসার স্থল ছিল আল্লাহর মাতা'র সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করা। রোম সম্রাট জাষ্টিনিন তাঁর একটি আইনের ভূমিকায় হযরত মারয়ামকে তার রাজত্বের সংরক্ষক ও সাহায্যকারী গণ্য করেছেন। তাঁর প্রখ্যাত সেনাপতি নারসিস যুদ্ধ ক্ষেত্রে হযরত মারয়ামের কাছ থেকে নির্দেশনা চাইতেন। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন রোম সম্রাট হিরাকেল তার পতাকায় আল্লাহর মাতার ছবি এঁকে রেখেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এ ছবির বদৌলতে এ পতাকা কোনদিন ধূলায় লুন্ঠিত হবে না। যদিও পরবর্তী শতাব্দীগুলোয় সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবে প্রটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টানরা মারয়াম পূজার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ জানায় কিন্তু রোমান ক্যাথলিক গীর্জাগুলো এখনো তাদের আগের পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছে।